KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৬
Collection : KLMLGK	Publisher : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
Title : অন্তরীপ (ANTAREEP)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 3/3 3/4 12 12	Year of Publication : আষাঢ় সংকলন ১৩৯৫ 1988 May 1990 May 1991
	Condition : Brittle Good
Editor : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	Remarks :

CD Roll No : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্তরীপ
মে ১৯৯১

অন্তরীপ

সন্দীপ দত্ত
সৌজন্যে
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অন্তরীপ

দ্বাদশ সংকলন মে ১৯৯১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ক্রম

৫-৮ যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার অমলেন্দু বসু

পাথর কুড়িয়ে পাথর ভেঙে : অমিতাভ গুপ্তের কবিতা

৯-১৭ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

১৮-৪৫ দিব্য মুখোপাধ্যায় সংযম পাল চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ব্রত চক্রবর্তী নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় অনিতা অগ্নিহোত্রী সুবোধ সরকার নির্মল হালদার মৌ দাশগুপ্ত বিপুল চক্রবর্তী জহর সেনমজুমদার দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বজিৎ পান্ডা শবরী ঘোষ বিশ্বনাথ গরাই প্রমোদ বসু তীর্থঙ্কর মৈত্র তাপস রায় অরুণাংশু ভট্টাচার্য প্রবীর ভৌমিক খোকন বসু সুদীপ্ত মাজি সন্জয় ভট্টাচার্য অমিত আদক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মৃণাল মোদক সব্যসাচী সরকার পৌলমী সেনগুপ্ত শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

৪৬-৪৮ শব্দের শুচিবাই মল্লিকা সেনগুপ্ত

৪৯-৫১ দাঁড়াবার জায়গা ব্রত চক্রবর্তী

৫২-৫৭ প্রতিকবিতার বীজে রাহুল পুরকায়স্থ

৫৮-৫৯ মরিস কারেমের কবিতা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৬০-৬৩ ভোরের কবি ফিলিপ জাকোতে সুজিত সরকার

৬৪-৭০ 'সাদা ও প্রতীকী' কবিতার চিত্রকল্পে রণজিৎ দাশ সুভদ্র পাঠক

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদনা সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

এই সময়ের কবিতা

অনন্য রায়	আলোর অপেরা
অমিতাভ গুপ্ত	নির্বাচিত কবিতা
বীতশোক ভট্টাচার্য	অন্যযুগের সখা
শ্যামলকান্তি দাশ	আমাদের কবিজন্ম
জয় গোস্বামী	গোল্লা
গৌতম চৌধুরী	অমর সার্কাস
সুবোধ সরকার	চন্দ্রদোষ ওষুধে সারে না
জমীল সৈয়দ	নীলক্ষুর চন্দ্রযান
নির্মল হালদার	বিবাহমঙ্গল
সব্যসাচী দেব	এই আমার প্রতিশ্রুতি
রণজিৎ দাশ	সময়, সবুজ ডাইনি
প্রমোদ বসু	মানুষ কিভাবে যায়
তুষার চৌধুরী	ডোমকাক ও বহ্নিশিখা
সুজিত সরকার	আকাশ আরো আকাশ
সুতপা সেনগুপ্ত	আনতবজ্রা
সুব্রত সরকার	সহ্য করো, বাংলা ভাষা
একরাম আলি	আঁধার তরঙ্গ
বিপুল চক্রবর্তী	রাত্রিজল ছুঁয়ে জেগে আছি
মল্লিকা সেনগুপ্ত	হাঘরে ও দেবদাসী
রাহুল পুরকায়স্থ	৯ই ভাদ্র ৯৫
নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়	যাওয়া নেই ফেরা নেই
রূপা দাশগুপ্ত	সেগুন কাঠের পা
অরুণাংশ ভট্টাচার্য	কৃষ্ণকথা, ফুল
অনিতা অগ্নিহোত্রী	চন্দন গাছ
জহর সেনমজুমদার	প্রণয় পালকি
অঞ্জলি দাশ	পরীর জীবন
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাসক লিপিকা
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়	দেবীপক্ষে লেখা কবিতা
সংযম পাল	কলা বৌ
সঞ্চয়িতা কুণ্ডু	মেঘবর্ণ রাখাল

অন্তরীপ-১২

'অন্তরীপ' কবিতাপত্রের দ্বাদশ-সংকলন প্রকাশলগ্নে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে দুটি শোকান্তিক ঘটনায়। প্রবন্ধ ও কবিতাজগতের দুই প্রথিতনামা পুরুষ প্রয়াত হলেন মাত্র দু-মাসের ব্যবধানে।

গত ২০শে জানুয়ারি বিশিষ্ট কবি-প্রাবন্ধিক নিখিলকুমার নন্দীর অকালমৃত্যু আমাদের কাছে আত্মীয় বিয়োগের সমতুল্য। 'পূর্বাশা'য় তাঁর প্রথম আবির্ভাব। পরবর্তীকালে অগ্রজ, কবি সুনীলকুমার নন্দী সম্পাদিত 'অনুক্ত' পত্রিকার অন্যতম সংগঠক নিখিলকুমার আমৃত্যু সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন শাখায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সক্রিয়ভাবে। প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায় তিনি রেখে গেলেন প্রবন্ধগ্রন্থ 'দেশকাল ঃ সাহিত্য', অনূদিত কবিতাগ্রন্থ 'সেক্সপীয়রের সনেট', সম্পাদিত গ্রন্থ 'সরোজকুমার রায়চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ গল্প', ইত্যাদি। 'অন্তরীপ'-এর জন্য তাঁর ছিল অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা আর অকপট প্রেম।

সাহিত্যজগতের বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক কবিতাপ্রেমী ডঃ অমলেন্দু বসু লোকান্তরিত হলেন ২০শে মার্চ। রেখে গেলেন এক অপূরণীয় শূন্যতা। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবিরল সব্যসাচিতা ছিল আমাদের কাছে এক ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে আলোকিত হয়ে রইল তাঁর তিনটি গ্রন্থ,—'সাহিত্যালোক', 'সাহিত্যচিন্তা' আর 'জীবনানন্দ'। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিতার মূল্যায়নে 'বাক্‌প্রতিমা' এই শব্দজোট ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষের জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। তাঁর জীবনানন্দ-সম্পর্কিত একটি নিবন্ধের পুনর্মুদ্রণের সূত্রে তিনি শ্রদ্ধায় স্মৃত হলেন 'অন্তরীপ'-এর এই সংখ্যায়, সূচনায়।

কবিতার শরীরে শব্দ-সম্বন্ধীয় শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রশ্ন তুলেছেন একালের একজন মহিলা কবি ; আর এই প্রজন্মের কবিতার সংসারে সংকট, অভিমান আর আশ্রয়হীনতার অসহায় চালচিত্র প্রকাশ পেয়েছে এক তরুণ কবির ব্যক্তিগত গদ্যের আঁচড়ে।

কবিতায় প্রতিধ্বনিত হল ঠিক এই মুহূর্তের নির্বাচিত উচ্চারণ।

বিদেশি কবিতার বিশিষ্ট দুজন অনূদিত হলেন এই সময়ের একজন প্রবীণ ও নবীন কবির হাতে।

এ-ছাড়া সবিস্তারে মূল্যায়িত হলেন সমসময়ের দুজন বিশিষ্ট কবি ; আলোচিত হলেন আরো একজন সাম্প্রতিক কবি, তাঁর গুচ্ছ কবিতার নিরিখে।

['অন্তরীপ'-এর এ সংখ্যা শুরু হল একটি পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধের বাঞ্ছিত উদ্ধারে। সদ্যপ্রয়াত এ যুগের অন্যতম পথিকৃৎ প্রাবন্ধিক অমলেন্দু বসু জীবনানন্দের কবিকৃতির মূল্যায়নে সংযোজিত করেছিলেন বেশ-কিছু স্বকীয় প্রবন্ধ, — সপ্রশ্ন বিশ্লেষণী দৃষ্টির সঙ্গে যেখানে সহৃদয় সমালোচনার মেলবন্ধন ঘটেছিল। উদ্ধৃত প্রবন্ধটি তাঁর ১৯৮৪-তে প্রকাশিত 'জীবনানন্দ' গ্রন্থের প্রথম নিবেদন : 'যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার'। কিন্তু লেখাটির আদি প্রকাশ ১৯৫৫-য়, কবির দেহান্তের অব্যবহিত পরেই। সেদিক থেকে প্রবন্ধটির সময়গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনানন্দের কবিতায় আজন্ত বিকীর্ণ যে মৃত্যুভাবনা, তা থেকেই তিনি কবির জীবনমৃত্যুর ব্যবধান-লোপী এক সমীকৃত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এ লেখায়। কোন্ বিশেষ অর্থে কবি নিঃসঙ্গ আর নির্জন, তারও নতুনতর সন্ধান পাওয়া যাবে এ রচনার শেষ দিকে। উল্লেখযোগ্য যা তা হল কত ঘন সংক্ষিপ্ততায়, ভাষার ওপর কী অসামান্য অধিকার নিয়ে এবং তীক্ষ্ণ রসবোধের নির্ভরতায় তিনি তাঁর ব্যাখ্যা জ্ঞাপন করলেন অনুসন্ধিৎসু কবিতাপাঠকের কাছে। এই পুনর্মুদ্রণেই ধরা রইল তাঁর বিরল সমালোচনা-প্রতিভার প্রতি আমাদের বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ। —গ. অন্তরীপ]

যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার

অমলেন্দু বসু

সময় আসে, যখন সমালোচক রক্তলেখনী, শিল্পবিচার হৃতসূত্র। যে-কবির অবিস্মরণীয় সুরের রেশ দীর্ঘকাল অন্তরে বেজেছে, তাঁর সদ্য-প্রয়াণের পরে সে-সুরে আবার নতুন ক'রে আচ্ছন্ন হতে হয়। ঠিক এ সময়টিতে সুর-বিশ্লেষণ হৃদয়হীন, বিশেষত যদি কবির সঙ্গে মুগ্ধ পাঠকের সুহৃদ্‌সম্পর্ক থেকে থাকে।

সামান্য বিচারে মৃত্যু শোকোদ্দীপক ঘটনা। তবুও, তার নিষ্ঠুর আকস্মিকতা সত্ত্বেও, জীবনানন্দের মৃত্যু, তাঁরই নিরিখে, হয়তো শোকাবহ নয়। শুরু থেকে শেষ অবধি তাঁর কাব্যে মৃত্যুর অজস্র ভাবনা অপূর্ব গীতরূপ পেয়েছে, কখনো অপার বিষণ্ণতায়, কখনো বেদনার উল্লাসে, কখনো শকুন-ক্লান্তির কলরোলে। 'সব ভালোবাসা যার বোঝা হ'ল—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবাসে।' সেই বহু-অভিলষিত, বহুবার প্রিয়-নামে-ডাকা মৃত্যু লৌকিক নিরিখে শোকাবহ, কিন্তু এ-মৃত্যু কি জীবনানন্দের অনন্য নিভৃত কবিসত্তার অতি সহজ পূর্ণতাপ্রাপ্তি নয়?

মৃত্যুর ভাবনা জীবনানন্দে নিরবচ্ছিন্ন। "বনলতা সেন" অবধি রচনান্তরের প্রতি কবিতায় মৃত্যুর কোনো-না-কোনো উল্লেখ, স্পষ্ট উচ্চারণে অথবা তির্যক প্রতীকে উপস্থিত। কবির জীবনোপলব্ধির নাভিমর্মে মৃত্যুর অব্যয় ভাবনা, অন্য সব ভাবনা ঘুরে ফিরে এই কেন্দ্রের সংযোগে সঞ্জীবিত।

যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে
হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি
কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইসারায়
জনলে গেছে কতবার ; ঝ'রে গেছে তৃণ, রাত্রিদিন পাড়িতেছে ঝ'রে
ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন
পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
মরণের পরপারে বড় অন্ধকার
গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফাঁড়ং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ

এমন কি "সাতটি তারার তিমিরে", যেখানে ইতিহাসচেতনায় শিল্পীচিত্ত প্রবুদ্ধ, যেখানে "নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে" মানুষ চেতনার দিনে অলক্ষ অরুণোদয়ের গান গায়, সেখানেও মৃত্যুর উপমার পুনঃপৌনিক আবির্ভাব।

নিমীল আগুনে ঐ আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মত

বেরিল মণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু
পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোষে

এই তো জীবন :
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে

মানবের মরণের পরে তার মনির গহ্বর

দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হ'য়ে মৃত হ'য়ে স্তব্ধ হয়

এই মৌল মৃত্যুমুখী ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে এমন কি কবির বহুব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলিতেও : ঝরিয়া গেছে ; মুছিয়া গেছে ; থাকিবে না ; কেঁপে ; ছিঁড়ে ;

হাওয়া হ'য়ে ; ভূত হ'য়ে ; (গান কোন্ দিকে) ভেসে যায় ; উড়ে যায় ; রহিবে না। এ কয়টি ক্রিয়াপদ কুড়ি ছত্রের একটি মাত্র পাতায় পাচ্ছি। আরো কুড়ি ছত্রের মধ্যে নেতিসূচক শব্দ কতগুলি : আসেনি ; বোনে নাহি ; নিরাশা ; যাব নাক' ; নির্জন ; নিঃসাড় ; থামিতে হয় ; নিঃস্তব্ধ ; নিমীলিত ; স্বাদহীনতা। আর এই মৃত্যুমুগ্ধ অনুভূতিতে স্বপ্নলোকবাসিনী মোহিনী ("পরী নয়,—মানুষও সে হয়নি এখনো") বলতে পারে "ফুলগুলো বাসি নয়,—আমি শুধু বাসি"। আর তাই দুদন্তের শান্তি-দেওয়া নারীর "ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন", আর "স্বপ্নের ধনিরা এসে ব'লে যায় : স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো।"

সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রব বিছানায় শুয়ে ;
অন্ধকারে চৈস দিয়ে জেগে রব
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।
স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।

এই নিরন্তর মৃত্যুচেতনা, স্থবিরতা-স্পৃহা, পীড়াজীর্ণ চিত্তের অসুস্থতা নয়, কেননা জীবনানন্দর শিল্পীমানস নিশ্চেতন স্থবিরতাকে যত আহ্বান করেছে, উত্তাল ক্ষমতাকেও ততই আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

হে ক্ষমতা,—বিদ্যুতের মত তুমি সুন্দর—ভীষণ !
মেঘের ঘোড়ার 'পরে আকাশের শিকারীর মত ;—
সিন্ধুর সাপের মত লক্ষ ঢেউয়ে তোল আলোড়ন !
চমৎকৃত কর,—শরীরেরে তুমি করেছ আহত !

আসলে জীবনানন্দের মৌল জীবনোপলব্ধি সামান্য লৌকিক বিচার থেকে আলাদা। সব জিনিসকেই পৃথক্‌কৃত স্বতন্ত্র সত্তায় চিন্তা করা সামান্য যুক্তিবাদী বিচারের স্বভাব। স্থবিরতা ও বেগ, প্রেম ও অপ্রেম, জীবন ও মৃত্যু, আলো আর অন্ধকার, এদের মধ্যে নিঃসংশয় সীমানা, অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, এমন কি পরস্পর-বিনাশী বৈপরীত্য বর্তমান ব'লেই আমরা ভেবে থাকি। কিন্তু যে সীমানা বুদ্ধির কাছে সুস্পষ্ট, হৃদয়ের সহজ অনুভূতিতে তা অবলুপ্ত হ'তে পারে। আলো-অন্ধকার দিয়ে বোনা সে-অনুভূতি "দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে" "ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া" "হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়"। জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান-লোপী মনোভাব দার্শনিক মতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায় ; এই দার্শনিক মত যদিচ আদৌ সুপ্রচারিত নয়, তবু জীবনানন্দর মনোভাব যুক্তিনির্ভর ছিল বলে মনে হয় না, অন্তত "বনলতা সেন" অবধি কাব্যগ্রন্থে নয়। এ-মনোভাবে জীবন

ও মৃত্যুর ব্যবধান গ্রাহ্য নয়, বরং জীবনে মৃত্যু, মৃত্যুতেই জীবন, গতি ও নিশ্চলতা অভিন্ন, গোধূলি ও কুয়াশায় দিনের ও রাত্রির আলো মিলিয়ে একাকার। এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাকাব্যে অভিনব। ক্বচিৎ রবীন্দ্রনাথের মানসনেত্রে গোধূলির আবছায়া হয়তো উজ্জ্বল শরীর পেয়েছে, কিন্তু প্রেতলোক কখনোই মনুষ্যলোকে রূপায়িত হয় নি। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কলিন্স ও কোলরিজে এই একাত্মদৃষ্টি সম্ভব ছিল, ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারে ও ইয়েটসে এই মায়াবী দৃষ্টির আবির্ভাব পুনরাবৃত্ত, কোনো-কোনো ফরাসী কবিও আলো-আঁধারি জগতে বাস করেছেন। জীবনানন্দ ইংরেজী সাহিত্যের ধীমান পাঠক ছিলেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিদেশী প্রভাবে গ'ড়ে বা বেড়ে উঠেছিল এমন মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ দেখি না, কেননা তাঁর মায়াবী দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য একাত্মদৃষ্টি তাঁর নিজস্ব কল্পনায় উদ্ভূত আর বহু-পরিচিত পরিবেশের রসে পুষ্ট। মনে হয় এই একাত্মদৃষ্টি বাঙালি কবির পক্ষে সহজ হওয়া উচিত, কেননা বাংলাদেশের কোনো-কোনো অঞ্চলের নিসর্গ-পরিবেশ এ-দৃষ্টির পক্ষে সহজেই অনুকূল, আর কবিমাত্রেই নিসর্গ-পরিবেশ দ্বারা কমবেশি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, বিশেষত বাঙালি কবি। কিন্তু খুব কম কবিই জীবনানন্দের মতো এত সহজ সহানুভূতিতে নিসর্গ পরিবেশের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, দুই নদীর সংগমের মতো সহজে, জলধারা মিলনের অনির্দেশ্য সীমারেখায়। সব কয়টি ইন্দ্রিয় দিয়ে নিসর্গ পরিবেশের অসংখ্য বিচিত্র প্রভাব তিনি গ্রহণ করেছেন নিয়ত, তাই তাঁর কাব্যে শব্দ, স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, এমন কি স্বাদেরও বাচনিক রূপ নিরন্তর প্রকাশিত। জীবনানন্দর এই নির্দ্বিধ সানন্দ নিসর্গ-সহানুভূতি, আর তাঁর তুরীয় অনুভূতিপন্থা—যাকে তিনি বলেছেন "বোধ" —তাঁর দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যুকে একীকৃত করেছে, সে একীকরণের ফলে জীবন ও মৃত্যু উভয়েরই ঐশ্বর্য বেড়েছে সহস্র গুণ। যে-মৃত্যু লৌকিক ধারণায় অবসান ও সর্বনাশ, সে মৃত্যু এই আনন্দিক ধারণায় জীবনেরই অভিন্ন রূপ, এমনকি, জীবনের পরাকাষ্ঠা।

এই বিরল মানসের অধিকারী ছিলেন ব'লেই জীবনানন্দ বিশেষ অর্থে নির্জন, নিঃসঙ্গ কবি।

রচনাটি সৌজন্য-অনুমতিক্রমে পুনরুদ্ধৃত হল 'জীবনানন্দ' গ্রন্থ থেকে। এটির প্রকাশক শ্রীঅবনীপ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

পাথর কুড়িয়ে পাথর ভেঙে ঃ অমিতাভ গুপ্তের কবিতা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়ায় রাখি ধ্বনিত ব্যঞ্জনা

সাপ মুখ দিয়েছে ফসলে, পড়ে আছে
উচ্ছিষ্ট ধানখেত
যুবতীর মতো

সেদিন হেমন্তে ঃ মাতা ও মৃত্তিকা

পাথর কুড়িয়ে নিলে শব্দ হয়, মনে হয় ডালপালাগুলি
জেগে ওঠে

কুড়ানী ঃ ঐ

চুড়ির টুকরোর মতো কয়েকটি কাচের সন্ধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে

বাগানে ঃ আলো

'আলো'য় অন্তত এটুকু প্রচ্ছন্ন প্রাক্‌ইঙ্গিত ছিল, একজন কবি সৎ অনুভবের অংশভাক্ হয়ে স্বকীয় কণ্ঠস্বরের নির্ভরতায় সাম্প্রত কবিতায় আসছেন। আমাদের প্রত্যাশা প্রতারিত হয়নি, স্বস্তি লাগে ভেবে। সময়ক্রমে বিবর্তনের সূত্রে আমরা টের পেলাম তাঁর কবিতা আপনচরিত্রে কবিতাই হয়ে উঠছে ক্রমশ, —মিতভাষণের পথ বেয়ে, সংবেদী চিত্রকল্পের সম্পন্নতায়, নির্জনতম শব্দের গাঢ় সঞ্চারে। পাথর কুড়িয়ে নিলেও সেখানে আরণ্য নৈঃশব্দ ভেঙে যায়, সান্ধ্য মুহূর্তগুলো চুড়ির টুকরোর মত চূর্ণ হয়ে পড়ে থাকে এদিক-ওদিক, অথবা বিস্তীর্ণ ধানখেত হয়ে ওঠে উচ্ছিষ্ট অসহায় এক যুবতীর প্রতীক-অনুবাদ। শোক থেকে উঠে আসে কিছু, কিছু উন্মোচিত হয় সহজ প্রত্যক্ষণে; 'শ্যাওলাধরা অন্ধকারে' ফিরে পাই কাউকে, 'অনেক ক্রোদ অনেক খরা'য় জ্বলে ওঠে কেউ কেউ; 'সূর্যোদয়ের কোনো না-দেখা দৃশ্যের দিকে' শুরু হয় তার যাত্রা, কিংবা 'অশুভ-চিহ্নের মতো সূর্যাস্তের কিছু আভা' ছড়িয়ে যায় চারদিকে। আনন্দ-বেদনায় একাকার পৃথিবীতে তখন বাক্‌প্রতিমা ঘন হয়ে আসে অনুচ্চার্য সংক্ষিপ্ততায়,

ট্র্যামের শব্দের মতো বহুদূরে চলে যাচ্ছে সুখ
ট্যাক্সির হর্নের মতো বহুদূরে চলে যাচ্ছে দুঃখ

অন্ধযুগ ঃ এসো আমার ঘরে

অমিতাভ গুপ্তের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'আলো' ১৯৭০-এ প্রকাশিত। 'নির্বাচিত কবিতা' সংকলন ১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। মাঝখানে বছর কুড়ির ব্যবধানে নিয়মিত চর্চার ফসল—

'এসো আমার ঘরে' (১৯৭৭), 'এক বছরের সামান্য কবিতা' (১৯৮১), 'ঝরা মানুষের কবিতা' (১৯৮২), 'মাতা ও মৃত্তিকা' (১৯৮৪), 'খরা ও যমুনা' (১৯৮৭), ও 'সূর্যে ধ্বনিপটে' (১৯৮৯) ; এবং ওই একই বছরে তাঁর সম্পাদিত সগদ্য কবিতা সংকলন 'উত্তর আধুনিক কবিতা'।

'আলো'-র একটিমাত্র কবিতার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা কিনা অমিতাভ-র পরবর্তী কবিতাকর্মের প্রেক্ষিতে আমার খুব চরিত্রবান বলে মনে হয়েছে। সেই 'বাগানে'রই কয়েকটি উদ্বোধনী ছত্র ঃ

শ্রাবণীর জন্মদিনে পথ চিনে দক্ষিণেই ফিরে এলো আপেলবৃক্ষটি।
নগ্ন দেবতার মতো শ্বেতপাথরের বেদী নিঃশব্দে হেসে ওঠে, নত
গাছটিকে অভ্যর্থনা করে যেন ঈষৎ দুঃখিত হয়ে, পরে উপহার দেয়
স্মৃতিচিহ্নের মতো শ্রাবণীর উজ্জ্বল করোটি !

এই মুহূর্ত থেকে, লোকায়ত জীবনের মিথ, প্রাচীন পুরাণ, আধ্যাত্মিকতা, মানবাতীত রিচুয়ালিস্টিক্ অনুষঙ্গ-ভাবনা থেকে উঠে আসছে অমিতাভ-র কবিতাপ্রয়াসের সিংহভাগ। সেই সঙ্গে পাঠক খেয়াল করুন তাঁর জড়তাহীন ভাষার প্রত্যয়ী প্রয়োগ। ছন্দে সমর্পিত না হয়েও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে বিশেষণকে একলা ফেলে পরের লাইনে বিশেষ্যের হাত ধরতে কুণ্ঠিত নন তিনি, এবং ঘটনার অনুক্রমকে 'হয়ে' এবং 'পরে' এইভাবে সাজিয়ে কালনির্দেশ করছেন অব্যর্থতায়। উপমা আসছে পায়ে পায়ে—'নগ্ন দেবতার মতো' এবং 'স্মৃতিচিহ্নের মতো', ইত্যাদি। প্রথম ছত্রে অন্ত্যমিলের আচমকা অভিঘাত ('জন্মদিনে', 'পথ চিনে', 'দক্ষিণেই') একটি অভিনব নজীর। আর আশ্চর্যতর চমক অপেক্ষায় ছিল ওই কবিতারই কিছু পরবর্তী লগ্নে,—'যে কোন গভীর বনে হঠাৎ যেমন করে না দেখা বাঘের গন্ধ হাওয়ায় বাতাসে / এখানে স্মৃতির ঢেউ—মায়াবী বাগান দোলে, যেন অসম্মত, / চোখের পলক ফেলা শেষ হতে না হতেই চতুর্দিকে দৃঢ় মহীরুহে / জেগে ওঠে....'। বাক্যের অসমাপ্তি এবং সেই সূত্রে নিহিত দ্যোতনা,—কবিতায় একে প্রয়োগ করে নতুন মাত্রা সংযোজনে প্রথমাবধি বিশ্বাস ছিল তাঁর, দেখেছি ; এবং সেই স্বভাবজ ভঙ্গিমা সমায়ান্তরে চর্চিত হয়েছে কবিতার পর কবিতায়,

....আমরা দেখেছি যুদ্ধ। তারপর সূর্যাস্ত। মেরিন ড্রাইভে
সাত বছরের মেয়ে রজনীগন্ধার মালা বিকোতে এসেছে

কোমল আগুন। ওই জল। ওকে মেয়েটির কাছে নিয়ে চলো
গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া ঃ খরা ও যমুনা

এবং আমি নিঃসংশয়, এই চূর্ণ বাক্‌প্রয়োগরীতি, এই ছিন্ন অল্পভাষিতা তাঁকে মিতব্যয়িতার দিকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে গেছে, শব্দশাসন পৌঁছেছে প্রায় শিল্পের স্তরে, ঘন উচ্চারণে একধরনের নিজস্বতা অপ্রকাশ্য থাকে নি। প্রকাশভঙ্গির এই সংহত পরিমিতি অমিতাভ-র কবিতায় একটি উল্লেখ্য অভিজ্ঞান,

অন্য কিছু নয়
আমি কেবল সেই পর্বতশৃঙ্গের কাছে

দায়বদ্ধ, সত্য সম্পর্কে যা কিছু জানি
উন্মোচন ক'রে দেব ব'লে

তেনজিং বলেছিলেন ঃ খরা ও যমুনা

এদিকে সময় যত চলে যায় মানুষের মাথা তত ছোট
হ'য়ে আসে —জনাকীর্ণতায় পোড়া পেশী

নিয়ে অবিকল তারা উঁকি মেরে দেখেছিল মেঘবিদ্যুতের
রঙে ওই কাকলী ভঙ্গিমা

আদিম মিথুন

যখন নতুনভাবে ভেঙে ফেলি আধেক প্রতিমা
তোমাদের কথা মনে পড়ে

আটচালা বেঁধে রেখে গ্রামীণ কুমোর ফিরি ঘরে
জ্যোৎস্নায় অসীমে পথে পথে
টের পাই, ছড়িয়ে রয়েছে ওই প্রতিমার ক্ষমা

ছন্দবদলের বন্ধুরা ঃ সূর্যে ধ্বনিপটে

পাথর বলে না কথা

অমিতাভ-র কবিতায় পাথর কুড়িয়ে নেওয়ার শব্দ, পাথর ভেঙ্গে ফেলার শব্দহীনতা। আদিম পৃথিবীর মূল পর্বে জেগে আছে এই পাথর আর তার সঙ্গে সম্পৃক্ত এক অন্তর্গূঢ় প্রাচীনতা। শিল্পের, ভাস্কর্যের, সূক্ষ্মতার উৎসপ্রতীক এই পাথর একই সঙ্গে জীবন-স্পন্দন ও প্রাণশক্তিরও নিকটতম অনুষঙ্গবাহী। ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক কবিদের এক পূর্বসূরীর কাছে পেয়েছিলাম প্রাচীন বিশ্বের রহস্যঘন সাংকেতিকতার উল্লেখ, 'Turn but a stone, and start a wing' ; সেই অবলুপ্ত পৃথিবীর পাথরময় অস্তিত্বকেই যেন ভেদ করতে চাইছে অমিতাভ-র কবিচেতনা, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর ঔৎসুক্য। সামনে একটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, অতিক্রম করে যেতে হবে অনিঃশেষ পাথরের পথ,—নিশ্চল, মূক ;

প্রশ্নার্ত অসহায়তা, সেও বড় সংশয়ী, অনির্ণেয়,

আরো কতদিন পরে এ পাথর ভেঙে ভেঙে মূর্তি গড়া হবে
আরো কতদিন পরে পাথর পেরিয়ে আমি দেবতাকে পাব

মৃৎশরীর ঃ মাতা ও মৃত্তিকা

পাথরভাবনার সঙ্গে এভাবেই অন্বিত হয় মূর্তি, মন্দিরকারু, ভাস্কর্যসুষমা ; ঊর্মিমুখর সমুদ্রতট, ঝাউবন আর জলরাশি ; প্রাচীর, টিলা, নোনামাঠ ; কালোমাটি, শ্যাওলা, পাঁক ; মন্দির মসজিদের খিলান, মাদ্রাজের ঝর্ণা, মহাবলীপুরমের অনশ্বর ভঙ্গি, কুতুবমিনারের সম্পূর্ণ অবয়ব, সূর্যাস্তের কণারক ; এবং একটা অতিক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ভারতবর্ষ, যেখানে লাবণ্য ফুটে ওঠার অপেক্ষায় আছে রুক্ষ পাথর চিরে, যেখানে আপাতস্তব্ধ প্রস্তর ধ্যানী হয়ে ওঠে স্বর্গীয় প্রতীকের অন্তরালে,

লক্ষ করে ভাবি, আমাদের সব শিল্পপাথরের
দায় বুকে নিয়ে ওই দেবদারু মন্দিরপ্রণাসী

কণারক ঃ খরা ও যমুনা

....স্রোত আর চুনাপাথর দিয়ে ওই দিব্যতা
যে গড়েছিল, তাকে যেন দেখলাম ঢেউয়ের গর্জনে

জলশ্রী ঃ সূর্যে ধ্বনিপাটে

এবং ওই ভারতবর্ষ, তার ধূসর প্রাচীনতা নিয়ে, অন্তর্হিত ঐতিহ্য নিয়ে, স্মৃতিমেদুরতা নিয়ে, ধ্রুপদী পুরাণকথায়, বৈদিক ব্যঞ্জনায়, লোকোত্তীর্ণ মহাকাব্যিকতায় অমিতাভ-র কবিতার কোণে-কন্দরে অজস্রবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে ; আধুনিকতার আবহে কখনো জেগে উঠেছে সেই হারানো অতীত, কখনো-বা অনুস্মরণে উঁকি দিয়ে গেছে সাম্প্রত বাতাবরণ। এ তাঁর সম্পূর্ণত নিজস্ব একটা ভূমি যেখানে দাঁড়িয়ে কবিতার উপজীব্য তিনি ছেঁকে নেন অবলীলায়, বিষয়ের সান্নিধ্যে স্থাপন করেন আঙ্গিককে, শব্দশিল্পকে, বাক্‌ভাবনাকে। শুধুমাত্র শব্দপ্রবর্তনা ও চিত্রকল্পের সংস্থান যে পৌরাণিক বিষয় উদ্‌যাপনে কতখানি সহায়ক হয়ে উঠতে পারে, অমিতাভ-র কবিতায় তা ধারাবাহিকভাবে লক্ষণীয়। তাঁর নিজের উপলব্ধির শরিক হওয়া যাক, '....সেক্ষেত্রে কবিকে পূর্বসূরী কোনো কোনো কবির মিথ-ব্যবহারের রীতিটি খেয়াল করতে হয়। এর ফলে হয়ত মিথটির আদি প্রয়োগ বজায় থাকে না, কিন্তু এ'ধরনের প্রয়োগের মাধ্যমেও কবি তাঁর স্বভূমিকে গ্রহণ করতে পারেন নিজের রচনায়' (উত্তর আধুনিক কবিতা ঃ সরমা ও পরমা / প্রথম পর্যায়), কিংবা '....কিন্তু সেইসব ভাষার আপাতকাঠিন্যের আড়ালেই রয়েছে পুরোনো বাংলার দীঘির জল থেকে উঠে আসা মধুর অভিরাম আর সীতাকে ঘিরে ছোট ছোট বেড়া' (ঐ) ; অথবা,

'আজ যখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, ভ্রমণকালে আমাদের
চোখে পড়ে কোথাও, হুগলির কোনো অখ্যাত গ্রামে খরার মাঠ
থেকে শুকনো ধানের চারা উপড়ে ফেলছে কৃষক, কিংবা কৌশানির
ত্রিশূল-নন্দাবিদ্ধ আকাশকে কাঁপিয়ে জেগে ওঠা নিরন্ন শিশুর
আর্তনাদ যখন শুনি, তখন মহাভারতের কবির দেখা মাকেই
মিলিয়ে নিই একালের মাতৃমূর্তির সঙ্গে, মনে মনে'

মাতা ও মৃত্তিকা ঃ নিবেদন অংশ

ঠিক এই আত্মিক অনুভবের জায়গা থেকেই উঠে আসে অমিতাভ-র উচ্চারণমালা, তাঁর উপলব্ধির যাবতীয় উপচার, তাঁর ঐতিহ্যমুখী কাব্যিক আয়োজন। মৃতপ্রায় অতীত মেলবন্ধনে গ্রথিত হয়ে যায় জীবন্ত বর্তমানের সঙ্গে।

ভারতগাথায় আমি

একই সঙ্গে অতীতঐতিহ্যে আক্রান্ত আর আচ্ছন্ন হয়ে যায় তাঁর ডিকসন, শব্দবোধ আর বিন্যাস, এবং তা অনিবার্যরকম অবলম্বন হয়ে ওঠে তাঁর বিষয়গরিমার উদ্‌ঘাটনেও। বিশশতকের সীমান্তে পৌঁছেও তিনি অপ্রচলিত ধ্রুপদী শব্দে আশ্রয় নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, উপলক্ষ্যবিশেষে অবশ্যই। 'অযাজ্যযাজন', 'অরিষ্ট', 'ঈষিকা', 'সম্ভাবন', 'অপাবৃত', 'পলবল', 'কার্মুক' 'একাঘ্নী', 'অনুজীবি', 'প্রাগায়''-জাতীয় শব্দ তাঁকে অন্যমাত্রায় উদ্বর্তিত করে দেয় ; একই সঙ্গে বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রত্যাশায় জেগে ওঠে পাঠকের মন, তাঁর চোখ চলে যায় দূরান্তের ভারতবর্ষে, মহাভারতের অনুষঙ্গ চেতনায় নিবিষ্টতা ঘনিয়ে আসে এক লহমায়। যে কোনো পোস্টার নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর যাত্রা শুরু হয়, ইন্দ্রের সত্বায় খুঁজে ফেরেন নিজস্ব পরিচয়, এই মুহূর্তের কোনো বাঙ্ময় মুখে আবিষ্কার করেন দ্রাবিড়মায়ের মুখের আদল, নদীর বুকে কুড়িয়ে নেন দ্রুপদকন্যার প্রতিচ্ছায়া, মৃৎশরীর কালোমাটি অজন্তার কৃষ্ণকুমারীর প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে মুহূর্তেই। 'মাতা ও মৃত্তিকা'র একটি কবিতা,—'অপত্য',—চিত্রল, ঘনবদ্ধ, নিটোল, 'মানুষের শেষ কিছু ভালবাসার প্রেক্ষিতে লেখা, উচ্চারণ যেখানে প্রায় স্তোত্রের মত ঘন হয়ে ওঠে,

নদীর কিনার ছুঁয়ে গীতার মন্ত্রের মতো
ছোট ছোট ঢেউ
অযোনিসম্ভব পুত্র এইমাত্র ফিরে এল স্নান শেষ ক'রে

কিংবা আরবসাগরের বেলাভূমিতে যখন তিনি ছড়িয়ে দেন কবিতার দিব্যাস্ত্র, মৃগয়ার পটভূমি তৈরি হয়ে যায় নিমেষেই, খাণ্ডবদাহনপর্ব স্মারকের ভূমিকা নেয়, এবং ঠিক

তখনই পাঠককে তিনি হাত ধরে পে'ছি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন মহাভারতীয় ভারতবর্ষের সুদূরতম অতীতে,

সমুদ্র, ছন্দের মতো। মানুষের আকাঙ্ক্ষার কাছে
আমি তাকে দেখেছি সম্মত হতে। অপ্রাকৃত জলের শিবির
থেকে কোলাহল ক'রে কৃষ্ণ ও অর্জুন জেগে ওঠে

শিবপুরা আইল্যাণ্ড ঃ মাতা ও মৃত্তিকা

অথবা, "শ্বশুরের ছেলে তাকে কালরাতে চুপি চুপি বলেছিল / 'ঘরে ঢের কেরোসিন আছে'", এই গাদ্যিক বিবৃতিতে সমাপ্তি সূচিত হয়েছে যে কবিতার শেষ দুই ছত্রে, তার শিরোনামের দিকে তাকাতেই 'গান্ধারী' চরিত্রের অন্তর্দোতনা ঝলসে ওঠে অন্যতর প্রেক্ষায়। নির্বিশেষের ঘরে যে বিশেষের নিহিতি, তা আর অপ্রচ্ছন্ন থাকে না ; আর থাকে না বলেই মন্দিরে মসজিদে যখন টিলা কিংবা প্রাচীর টলে যায়, ইতিহাস-মোচড়ানো সেই বিস্মৃত অধ্যায় থেকে মূর্ত হয়ে ওঠে লক্ষ্মণভাই আর ঊর্মিলা। হারিয়ে যাওয়া এক নগর এবং হারানো এক সভ্যতার পটপ্রেক্ষায় যখন পার্সি ফাউসেট, তার ছেলে জ্যাক আর তার সহচর র‍্যামে রিমেলকে তিনি সংস্থাপন করেন, ছাব্বিশ বছর পর যখন জঙ্গলের গহ্বরে অবশিষ্ট পড়ে থাকে তাদের হাড়ের টুকরো এবং করোটি, আজও যখন বুনো মানুষের দল ফিসফাস গুঞ্জনে উচ্চকিত হয়ে বলে ওঠে, তারা দেখেছে তিনজন বৃদ্ধকে হেঁটে চলে যেতে, তখন সমগ্র ভাবনায় একটা অনিবার্য রূপান্তর ছায়া ফেলে, অন্তরালে সক্রিয় হয়ে ওঠে 'বনপ্রয়াণপর্ব'। ধ্বংসগোধূলির আভায় নিজেরই বিপর্যস্ত চোখে তিনি টের পান অন্য কারুর প্রেতচ্ছায়া, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনি তাঁর নিরুপায় আর্তি, সকরুণ এক প্রার্থনা,

উপাচার, যজ্ঞবেদী, অগ্নিও প্রস্তুত
মেঘার্ত নদীর কাছে নগ্ন আমি, নিরঞ্জন আমি
তর্পণ প্রস্তুত তবু আমাকে কর্ণের কথা বলো

যুধিষ্ঠির ঃ কুন্তীকে ঃ মাতা ও মৃত্তিকা

ঠিক এইভাবেই অমিতাভ-র কবিতায় আমাদের চোখ রাখতে হয় বর্তমান আর অতীতে, সাম্প্রত আর স্মৃতির সমন্বয়ে, তাৎক্ষণিক থেকে শতাব্দীর দিকে। 'দ্রোণাচার্য', 'অম্বালিকা', "অস্ত্রসংগ্রহপর্ব ঃ 'ডকুমেন্টারি চাঁদিপুর' থেকে", 'গীতা ঃ বিশ্বরূপদর্শন-যোগ', 'মাদ্রী', 'অতিজীবন', 'তরুণ কবির প্রতি', 'অর্জুন ঃ কর্ণকে', 'চলো জুনপুট', ইত্যাদি ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনায় লেখা কবিতাগুলি আমার সিদ্ধান্তে সমর্থন জানাবে মনে হয়। মহাভারতের ধ্রুপদী চরিত্রের ভীড়ই যে শুধু আছে, তা নয় ; সেইসঙ্গে কবিতার পর

কবিতার আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়েছে হারানো ইতিহাসের আরো অনেকে, —এসেছে অতীশ ও শ্রীজ্ঞান, আকবর, তথাগত ; ওয়াল্টার র‍্যালে, এলিজাবেথ, মাউন্টব্যাটেন ; লিভিংস্টোন, তেনজিং আর রিখিয়ার বিষ্ণু দে। এদের সম্মিলিত অবস্থানে ঋদ্ধ যে বাতাবরণ, অমিতাভ-র কবিতায় তার তাৎপর্য গভীর,—স্মৃতিমন্থনে, সমকালের নিরিখে, মূল্যবোধের নজীর প্রবর্তনায়।

এভাবেই ভাষার সংসার

অমিতাভ-র মিতকথন প্রবণতার উল্লেখ আগেই করেছি। পরিবেশনে ঘনবদ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে সংহত বাক্‌শিল্পে, নিটোল চিত্রকল্পে, অব্যর্থ অনুষঙ্গে। আর এর সঙ্গে চিত্রধর্মিতার ছোঁয়া, সেও এক অতিরিক্ত সংযোজন। তিনি জানেন কোথায় কলম তুলে নিতে হবে, কোথায় ভেতর-ব্যঞ্জনার শুরু, কোথায় অকথনেই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যাবতীয় উচ্চারণ। দশ লাইনের কবিতায় দেড় লাইনেই বেজে ওঠে সমগ্রের দ্যোতনা,

একটি নারকীশরীর পুড়ে ছাই হ'তে না হ'তেই
টেবিলের অন্যদিকে রূপ কানোয়ার

অ্যাক্ট ফোর ১৮২৯ ঃ
খরা ও যমুনা

অন্য একটি কবিতায় সমস্ত পঙ্‌ক্তির প্রতীক্ষা যেন টানটান্ জমা হয়ে থাকে শেষতম ছত্রের উন্মোচন-মুহূর্তের জন্যই,

বাঁক নিয়ে ফিরতেই চোখে পড়ে রাসপূর্ণিমার আলো
পড়েছে মস্‌জিদে

রাস ঃ খরা ও যমুনা

আবার স্মৃতিরোমন্থনে টুকরো অনুষঙ্গের উপস্থাপনা—যা প্রায় ক্যানভাসে অনুপুঙ্খ ছবি গড়ে তোলার মত—পাঠককে অকারণ সময় না দিয়েই অশ্রুসজল করে তোলে,

আশ্বিন, ধ্বংসবীজের মতো নীলরঙ আকাশের, নীচে
চালচিত্র ঃ মুখের গর্জনতেল, মনে পড়ে, দিদিকে মানাতো

শ্রীদুর্গা ঃ মাতা ও মৃত্তিকা

—যে দিদি বিবাহের উনিশ বছর ধ'রে ক্ষয়ে ঝ'রে তারপর শ্মশানে শুয়েছে।
কিংবা মাত্র চার লাইনে সম্পূর্ণ আটসাট অক্ষরের বিন্যস্ত ভঙ্গিময় তিনি ধ্রুপদী ব্যঞ্জনার

একটা ধ্রুব সত্যকে স্থাপন করতে পারেন একেবারে রুক্ষ বাস্তবের পোড়ো জমির ওপর ; কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উল্লেখ কবিতায় ঘটে না আদৌ, শিল্পিত শাসনে সে শুধু আশ্রয় পায় শিরোনামের সংবাদে, অথচ অন্তর্গূঢ় ব্যাখ্যার জন্য আমাদের অপেক্ষা উন্মুখ হয়ে থাকে কবিতাটির সমগ্র পাঠ শেষ হওয়া অবধি,

আমার সর্বস্ব বলতে পোড়া হাঁড়ি, কানাভাঙা থালা
একপেট খিদে
তাই নিয়ে ব'সে পড়ি, যেখানে যেমন পারি, যেমন সুবিধে

ভারতগাথায় আমি বিস্ময়চিহ্নের মতো ঃ মাগো, ফ্যান দাও !
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কবি ঃ মাতা ও মৃত্তিকা

গদ্যে মিতবাক্ হওয়া যতটা সহজ ও আয়ত্তাধীন, ছন্দে এবং সমিল ছন্দনির্ভরতায় সম্ভবত ততটা নয়। ভাষার ভাঙচুরের পথ বেয়ে মিলের দিকে এগোতে গিয়ে এবং মাত্রাবোধের কম-বেশি ওজন ঠিক রাখতে কিছু অবাঞ্ছিত শব্দের ভিড় ঘটে থাকে অনেক কবির হাতে। অমিতাভ সতর্ক দক্ষতায় সে-সব নজীরকে পাশ কাটাতে জানেন। তিনি জানেন কোন্ বিষয়ের উপযোগী কোন্ ছন্দ, কোনো বিষয় আদৌ ছন্দিত প্রকাশকে অনুমোদন করবে কিনা, কোথায় শুধু মিলের অভাবই খুলে দেবে বলবার যা কিছু তার সম্ভাবনাকে। আর জানেন বলেই 'মাগো, ফ্যান দাও' নির্মিলই থেকে যায় তাঁর হাতে, সঙ্গতকারণেই ঃ প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষতম শব্দের সঙ্গে তাকে জোটবদ্ধতায় রাখলে আহত হত যাবতীয় অভীপ্সা। অথচ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি মিলিত হয়েছে যেন নিজস্ব গরজে, স্বভাবগুণে। আবার 'ভাঙা রাস্তা'র মত কবিতায় আপাতলঘু বিষয়ই নির্বাচন করে দেয় ছন্দের দুলকি চাল এবং শব্দের ক্রমিক অভিঘাত, 'চায়ের দোকান মাস্তানেরা জিহ্বা চাঁছে চায়ের কাপে/নোংরা ঠোঁটের ছোপ পড়েছে গড়িয়ে পড়ে পঁজের মতো/নিয়ন আলো পেঁয়াজকুচি রাইসরিষা টুকরো শসা।' কিন্তু একটা প্রশ্ন রাখি। ছন্দে কুশলী যে তিনি ছন্দের স্বার্থে শব্দকে পর্যন্ত সংকুচিত করে অপূর্ব ভারসাম্য দেন এইভাবে—'তাঁর ছোঁড়ে সান্তালষুবতী' ('উর্মিঃ' খরা ও যমুনা), 'ঝরা মানুষের কবিতার 'দ্বিধা'য় তিনি কি একটু অন্যমনস্কই হতে চান স্বেচ্ছায়, অন্তত তার দ্বিতীয় স্তবকে ?

রিক্সাঅলা তাকে, আস্তে, মৃদু হেসে
বলল, 'দিদিমণি, হেথাকে নামবেন ?'
ক্ষয়াটে চেহারার রিক্সা —হাড়ওঠা
বুকের পাঁজরেরও একই দশা তার

শেষতম ছত্রের শ্লথ মুহূর্ত ('একই দশা তার') কি সতর্ক পাঠকের শ্রবণ-সমর্থন আদায় করতে পারবে ? দ্বিধাই থেকে যায় যেন। কিন্তু একই নিঃশ্বাসে স্বীকার করা দরকার তাঁর চিত্রকল্পের এবং শব্দের সাবলীল প্রয়াগক্ষমতাকে। 'কলকাতার ঈষৎ আঁতেল' কিংবা 'কাপ্তান বাদুর' এক সাহসী সপ্রতিভ কবিকে অনিবার্যতায় চিনিয়ে দেয় ; 'সনাল পদ্মের মতো' সঞ্চার করে এক স্বাদু অভিনবত্বের, আর এর পাশে আরো চমকিয়ে দিয়ে যায় 'ডিম্বপুরাণ'-এর এক ঝলক অতিসাম্প্রতিক বিতর্কউষ্ণ অন্বিত উপমা,

আস্তাবলের সামনে জনতার উঠল কোলাহল, যেন কেউ ঢিল
ছুঁড়েছে মধুচক্রে
যেন কবিসভায় দশকচিন্তার দড়িতে বাঁধা তরুণ কবিরা কবিতা
পড়ছে একসঙ্গে

'সূর্যে ধ্বনিপটে'র একটি নিরাভরণ কবিতা পেশ করে এ আলোচনার ইতি টানি। কবিতাটির নাম 'কাগজ',—

সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয়। তবু তার মায়াবী শাদার
কাছে, গোল হ'য়ে
ভিখারিরা বসে। অন্ন, স্থির

আজ বর্ণবোধ থেকে এভাবেই বিচ্ছুরিত হয়
ভিখারির প্রবল চীৎকার

শব্দ এবং শব্দের চূড়ান্ত পরিমিতিবোধ থেকে উঠে আসছে এ কবিতা,—সেখানে সংযম এতটাই যে শিরোনামের 'কাগজ' কবিতার শরীরে অনুচ্চারিতই থেকে গেল। কম-বেশি আয়তনের পাঁচটি ছত্রের মধ্যে যতিচিহ্নের ন্যূনতম ব্যবহার লক্ষণীয় ঃ দুটি পূর্ণচ্ছেদ আর সমসংখ্যক কমা ; এবং আরো গুরুত্ব কবিতার শেষে, সেখানে যতিচিহ্নের অনাগমন ছেদ না ঘটিয়ে যেন এক ব্যাপ্তি এনেছে স্বগতভাষণে। আপাতনজরে মিল শুধু প্রথম আর শেষ পঙ্‌ক্তির মধ্যে, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি চলে যায় প্রচ্ছন্ন কিছু অন্ত্যমিলের দিকেও—'তার' ঃ 'শাদার', 'গোল'ঃ 'প্রবল', 'স্থির', ঃ 'ভিখারির', 'স্বচ্ছ নয়',ঃ 'বিচ্ছুরিত হয়', ইত্যাদি। ধ্বনিসাযুজ্যে অগোচরে আবেদন গড়ে ওঠে 'অন্ন', 'বর্ণ' আর 'সম্পূর্ণ'-র মধ্যে, 'স্বচ্ছ' আর 'বিচ্ছুরিত'-র মধ্যে। 'মায়াবী শাদার' শুভ্রতার নির্যাস থেকে জেগে ওঠে কাগজের প্রতিভাবনা, সমার্থব্যঞ্জনা। আর তৃতীয় পঙ্‌ক্তির গোল-হয়ে-বসা বহুবচন মাত্র একটা লাইন পার হয়েই যেন ছড়িয়ে পড়ে একবাচনিক সর্বজনীন আর্তনাদে।

দিব্য মুখোপাধ্যায়

হায় জীবন

কি যেন খুঁজতে রাস্তায় নেমেছিলাম। ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে
এখন ঠিক মনেই পড়ে না। হে শেষ বিকেলের ট্রাম,
মনে পড়ে তোমার, সেইসব দিনগুলোর কথা—
আজ, অন্ধকারের ভেতর শুধু দেখছি, বেঁচে আছে পুরোনো শহর।

রাস্তা, আপনাকে

চাঁদের আলোয় একটা বিছানা থেকে ভেসে—অন্য বিছানায়—
সরাইখানার দরজা থেকে সরাইখানার দরজায়—
শত্রু ও বন্ধুরা হাততালি দিল, রাস্তায় রাস্তায় মুখ
মাইলস্টোনগুলো উঁচু হয়ে উঠল স্মৃতিফলকের মত ;

এখানেই শেষ খেলা ? ঘোড়দৌড় ? শেষ বাজি ?—একটা কালোকোট—
কে যেন পরিয়ে দিল ; কুকুরগুলো ডেকে উঠতেই, ঈশ্বর
চোখ মেরে জানালেন 'মৃত্যুর অন্য নামই জীবন'—তবে, প্রিয়তমা,
কেন এই দরজা থেকে দরজা, বিছানা থেকে অন্য বিছানায় !

সংযম পাল

পুণ্যব্রত

সামান্য যে পুণ্য করি আমি
তাতেই আমার দিন চলে, সঞ্চয়
গর্ভবতী বিড়াল-বালিকাকে
যখন আমি একমুঠো ভাত দিই
রাত্রে জাগে নবী ও দেবদূত

যেখান থেকে যেদিক থেকে মারো
পুণ্যপাতা আটকে দ্যায় তাকে
অক্ষমতার জ্বালা ও সন্দেহ
একশো তেরো জ্বরায় ঢেকে যায়
আমার হাসি আমার ভালোবাসায়
ধন্য আমার দিন চলে, সঞ্জয়।

বন্ধু

মরে যাওয়ার আগে
একটা ভাষা তৈরি ক'রে নিতে হবে, যাতে
মরে যাওয়ার পরেও
তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

বিষবপনের ছবি

১. বন্ধুকে

নখদর্পণ থেকে নেমে আসা আমার মুগ্ধতা, প্রথমেই ভিজিয়ে
দিলো চাঁদমারির মাঠ। তারপর, নখে ফিরে এলো। ভর-
দুপুরের নিষেধ এখন উড়তে উড়তে চিল। এই তো, আবারও
বন্ধ হয়ে আসছে ক্যামেরার চোখ আর তোমাদের থুতু ছেটানো
বারান্দায় উপুড় হয়ে ন্যাতা ঘষছে রামের মা

২. ঘূর্ণি

লেবুপাতায় মুড়ে বুন্টে আনতাম। গলিতে ছপছপ করে
লাফাতো জল। মনে আছে, কবে সে প্রথম আনলো অপমান ?
আনলো টোল খাওয়া বাসনের স্রোত ও নীল হয়ে যাওয়া
ঠোঁটদুটিকে ? ঝেঁকে বসলো আমাদের প্রার্থনার দিনগুলি

৩. আবহ

রূপমোচন নয়। সবুজ অক্ষরগুলিও আজ নয়ানজুলির
মতো দু-পাশে উপুড়। দুলে উঠছে সাপ। পদ্মফুল। খঞ্জ
মানুষজন বসে আছে রোদে। করতল, বর্ণমালা ফিরিয়ে নাও।
লজ্জায় কুঁকড়ে ওঠো। পটবদলের শেষে আজ আর আমাকে
গান গাইতে বোলো না কেউ

ব্রত চক্রবর্তী

দগ্ধ

হৃদি পুড়ে যাচ্ছে কে কাকে
বলবে।
দগ্ধ সকলেই।

আজ হৃদি এর পুড়ে গেল,
কাল ওর।
কে কাকে বলবে!

দোর খুলে কেউ বসে নেই,
তবু যাওয়া।
রাস্তা চিরে পথ তৈরি করে
কারু কাছে হাঁটু গেড়ে বলা :
আয়, বসি, শেকড়ে জড়াই, বহুদিন
একলা সোহহং।

কথা হয়, ব্যথা হয়, কাম হয়,
আঁকড়ে আহ্লাদ হয়, তছনছ হয়,
তারপর পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগে॥
হৃদি পুড়ে যাচ্ছে দেখে ছোটে
দুদিকে দুজন।

কে কাকে বলবে!

দীক্ষা

একটি হরিণ লাফ
মৃত্যু এনে দেবে।
কিন্তু আমি যাবো না যাবো না।

পৃথিবী বানান করি রোজ
গায়ে কাঁটা দেয়।

দোয়াত উপুড় হয়ে
রোদ্দুরের কালি
মাটিতে গড়িয়ে এলে,
আমি তাতে দীক্ষা নিই রোজ।

মন্ত্রমুগ্ধ বসে থাকি মন্ত্র পাব বলে!

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গোলাপ, তোমাকে

গোলাপ, তোমাকে ছিঁড়ে আনব না কবিদের কোলাহলে
তোমাকে দেখেছি স্নানঘরে একা, নিলাজ নিজেরই ছায়া
বুকে হাত চেপে দাঁড়ালে, লজ্জা পায়নি দ্বিধাম্পতি
যোনিরোমে তৃণে শিশিরে মিশেছে শীৎকার মৃত্তিকার

তুমি মিছিমিছি মঞ্চে এসেছ, গোলাপী শাড়ির নারী
বৃথাই এঁকেছ আঁখিপল্লব, রাঙিয়ে ও ঠোঁটদুটি
ভেবেছ ভোলাবে কবিদের? আমি অপাঙ্গে শুধু দেখি
নিজের কবিতা পড়া হয়ে গেলে উঠে চলে যায় ওরা

বেণীতে শঙ্খচূড় জড়িয়েছ, প্রথাহত প্রবীণেরা
বোঝেনা, কীভাবে তোমাকে পেয়েছি অমিতবীর্য ধ্যানে
কবিসভা থেকে বহুদূরে আমি শোকে উন্মাদ কেঁদে
শ্বাসের স্পন্দে ভালোবাসা বুনে লিখি, ফুল? মিছে কথা

গোলাপ, তোমাকে ছিঁড়ে আনব না উপমিতা ঊর্বশী
তোমাকে পেয়েছি স্নানঘরে ভুলে কবিতা লেখার খেলা

থাকলো পড়ে খেলার শহর

তোমার চেয়ে তাকেই খানিক বেশি ভালোবাসব বলে
ঘুমের পাশে হারিয়ে গেল হাল্কা ছোট লাল বাড়িটি
ব্যথার কালো উপত্যকায় জাগলো যে ঢেউ বজ্রতোয়া
অন্ধকারে ডাকলো হঠাৎ, এই মেয়ে, তুই কে ছিলি রে

গোলাপি নয়, লাল রঙও না, ঘরে রঙিন মেঘের মায়া
খানিক বেশি তাকেই ভালোবাসব বলে খুব গেরুয়া
ধুলোর গন্ধে ভরিয়ে দিচ্ছে গোধূলি চাঁদ, ছোট্ট শহর
এখন আমি কোথায় এলাম, কোন আবেশে এই চলাচল

ছুটি, তোমায় আরও ভালোবাসব বলে ছুটি হলো না
পেরিয়ে এলাম জ্যোৎস্না সেতু স্বপ্নকাঙাল অভ্যুত্থানে
তোমাকে নয়, তোমার মতন ঠিক কাকে যে দেখব বলে
ঘুমের থেকে ঘুমের দিকে যাওয়ার জন্য এমন তাড়া

থাকলো পড়ে রক্তমেঘস্তূপের ভাঙা খেলার শহর
তোমার মতন, অন্য কাকে খানিক ভালোবাসব বলে

অনিতা অগ্নিহোত্রী

মহুয়ার গাছ

গাঁওবুড়ো ডেকেছে আমায় আমি যাবো
মাঠজোড়া ধানচারা নয়ানজুলির চোখে জল
গাঁয়ের মুড়োয় এক মহুয়ার ঝিমঝিমে গাছ
কাঁঠাল কাঠের গাড়ী, বৃদ্ধবলদ ঘুম যায়

আমের চিকণ বন, ঘন ছায়া পেছনে ফেলেছি
গুলমোহরের গাছ, হলুদে ফুলের পাগলামি
কাঠঠোকরার ডাক, টরুর্ টরুর্, শাপলার
ঢেউ ভাঙা, ঘাট সিঁড়িটিকে বেশ পরিচিত লাগে

ওদেশে মাদল বাজে ওখানে আগুন জ্বলে ওঠে
বাসকলতার ফুল, তেঁতুলপাতার নাচ চুলে
ওরাম যুবতী নাচে, পিঠের কাপড়ে বাঁধা শিশু
ঘুমে নাচে, নাচে জেরারো ক্ষুধার্ত ছেলেটি

গাঁওবুড়ো ডেকেছে আমায়, আমি যাবো
পাহাড়ে পাহাড়ে জুম্, ধোঁওয়া ওঠে, যাবো
সাপের মতন পথ খোলস ছাড়ায়, আমি যাবো,
সে যায়, সে রয়ে যায়, ঝিমঝিমে মহুয়ার গাছ।

শহীদের অন্তিম ইচ্ছে

একদা আমাকে ঝলসাবে ইতিহাস
দুঃসাহসের দায়ে
থ্যাতা ইঁদুরের ফেনা ওঠা মুখে
শব্দ না থাক্ কোনো
ম্যানহোলে মাথা, কাকিনীর সাথে
লড়ে যাবো হাতে-পায়ে।

যারা পুঁথি লেখে, বই বেচে যারা
গ্রানাইটে এই চুমো
তারা কী বুঝবে ; আবক্ষকটি ক্ষুধা
তবু জ্যোৎস্নায় শিশু গাছটিকে ভেবেছি স্বপ্নদ্রুম

ওরা কিনে নেবে আভূমি আকাশ
স্বপ্ন বিকোবে হাটে
হলুদ পাতার স্ফুটমর্মরে দেবে কয়লার ধোঁওয়া
কানে সীসে আর পা গাঁথবে ক্রুশকাঠে

বিস্ফোরণের আগে যেন দেখি
এসে দাঁড়িয়েছ তুমি ; গলন্ত লাভা হেঁটে যায় নখতলে।
দুই হাতে মেঘ, অধরে সূর্য—।
অমরত্বের টোপ দিলে ইতিহাস
তুমি যেন ভুলে ভিড়ো না ওদের দলে।

সুবোধ সরকার

কাকে কিরকম দেখতে

কাকে কিরকম দেখতে এই নিয়ে
আমাদের মাথাব্যথা সবচেয়ে বেশী।

যে মেয়েটিকে খুবই ভালো দেখতে
তার একটা খারাপ কিছু বের না করা পর্যন্ত

আমরা শান্তি পাই না
কিছু না পেলে আমরা বলি মেয়েটার জিভটা সাপের।
খুব লম্বা সুপুরুষকেও আমরা ঢ্যাঙা বলে থাকি
যেমন সত্যজিত রায়।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকলে ভালো হত।
একটি মেয়ে সে যতই ভালো শিল্পী হোক
একটি মেয়ে সে যতই ভালো সাঁতারু হোক
একটি মেয়ে সে যতই ভালো অধ্যাপিকা হোক
তার কোমর ও বুকের মাপ নিয়ে কথা উঠবেই
এই একটা অভ্যেস থেকে আমরা বেরতে পারিনি।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানে থেমে গেলেও ভালো হত।
একটি পুরুষ যে বেশ্যাগমন করে না
একটি পুরুষ যে মদ্যপান করে না
একটি পুরুষ যে স্ত্রীকে মারধোর করে না
তাকেই তো আমরা ভালো লোক বলি। কি বলি না?

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেও থেমে গেলে পারত।
একটি মেয়ের সঙ্গে তার মাতৃবিয়োগের পর গঙ্গার ঘাটে
আমাকে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল
পরের দিন আমার স্ত্রীর কাছে সংবাদ পৌঁছয়
আমি মেয়েটির সঙ্গে সারারাত গঙ্গার পারে শুয়েছিলাম।

আসলে দাঁড়িয়ে থাকা আর শুয়ে থাকা, এর মাঝখানে
যে চন্দ্রালোকিত জীবন
তা আমরা ভুলতে বসেছি

পেট

মানুষের পেট নিয়ে যত ইয়ার্কি করা উচিত ছিল
আমরা তা করিনি

প্রেমিকার পেট হলে
প্রেমিকরা কি জিজ্ঞাসা করে 'ওটা কার'?

এ ব্যাপারে ভিখিরিরাই সবচেয়ে ভালো আছে।
ওদের খালি পেট নিয়ে যত দুশ্চিন্তা
ভরা পেট নিয়ে তত মাথাব্যথা নেই।
কোন গর্ভিনী ভিখিরিকে যদি জিজ্ঞেস করি 'ওটা কার'?
তবে অবশ্যই শুনতে হবে 'তোর বাপের'।

খালি পেট আর
ভরা পেট
ভরা পেট আর
খালি পেট
এর মাঝখানে জলতরঙ্গের মতো, স্বর্ণপতঙ্গের মতো
মানবজীবন।

আমরা খুব ভালো করে বাঁচবো বলে
ভালো ভালো খাওয়া-দাওয়া করে এলাম
জীবন যে এতো অলৌকিক
পেট না থাকলে জানতেই পারতাম না।

কিন্তু একদিন আমাদেরই অবিবাহিত ছোট বোনের পেটে বাচ্চা এল
আমরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম
দামী দামী ওষুধ এনে দিলাম
কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে এল শরীর একথা জিজ্ঞাসা করতে
'ওটা কার'?

নির্মল হালদার

ওপারে

চাঁদ আমাকে নিয়ে যাবে
এপার থেকে ওপারে
আমি কি একাই যাবো, নিয়ে যাবো সাধের পেয়ারা গাছটি
তুই কি যাবি এ্যাই পিঁপড়ে
তুই তো আমার কাছে সারাদিন ঘুরঘুর করিস

চাঁদ আমাকে নিয়ে যাবে এপার থেকে ওপারে

ওপারে ইস্কুল নেই ঘন্টাও বাজে না
আমরা বাজাবো বাজনা :
আমাদের পাকা পেয়ারা ডাঁশা পেয়ারা
কেউ পাড়বে না

মৌ দাশগুপ্ত

ব্যক্তিগত কবিতামালা

১.

কোথাকার ছেলে তুমি এখানে অদ্ভুত পথে ঘাটে
ঘুরে ঘুরে শহর চিনেছো
এভাবে কাউকে আর মাড়িয়ে মাড়িয়ে
ব্যবহার উপযোগী করতে পারোনি
পুরনো শহর আর নয় কলকাতা
আর নেই পথে পথে সঙের গাজন
অথবা এমনি ক'রে প্রতিদিন কেউ
আসে যায় তবু আর পারে না দাঁড়াতে
শেঠেদের জলসত্রে পিপাসা মিটিয়ে
বার বার টোকা দিতে কালীঘাটে
সবুজ কাঠের দরজায়।

২.

আবার সমস্ত মনে প'ড়ে গেলো
সেভাবে দু'হাত গুটিয়ে উপুড় হ'তেই
কী আশ্চর্য মনে প'ড়ে গেলো
ঝমঝম ছাদ আর ক্রমাগত হৃৎস্পন্দন
অভ্যস্ত ভঙ্গিটি ছাড়া আর কিছু
অত অনায়াস নয় ঠিক এমন সময়ে
বেজে ওঠে কাঁসর ভক্তির মতো

স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধমাখা জরির পোশাকে রাধাকৃষ্ণ
চামরের ওঠাপড়া মনে প'ড়ে গেলো
কীভাবে লুণ্ঠিত হতে বাসে ওঠার সময়
কীভাবে ময়লা দু' টাকার নোট হাতে গুঁজে দিতো
অন্ধকার বড় রাস্তা বেয়ে
মৃতদের খাট কেনাবেচা পেরিয়ে আবার
পৌঁছলে রেলের লাইনে যেখানে জানবে
এ কেবলি তোমার রাশির দোষ
কেবল তোমারি শরীর তাড়না
এইভাবে মনে পড়ে গেলো কার শ্বাসে কত বিষ
কীভাবে কে বাড়ি ফিরিয়েছে
এ সময় কীভাবে কে কোথায় দাঁড়াতো।

বিপুল চক্রবর্তী

যাওয়া, জ্যোৎস্নায়

তবুও সুবর্ণরেখা তুলিন জ্যোৎস্নায় ভিজে যাবে
তুমি আমি যাই বা না যাই
মুরগুমা পাহাড়ের চাঁদ
উঠে আসবে বিজ্ঞাপনহীন

তুমি আমি যাই বা না যাই
ঝিকিয়ে উঠবে বালিস্রোত
সোমবারি-মংলুর হাসি

২.

আমাদের যাওয়া
শুধু নিজেকে ভিজিয়ে নিতে ওই জ্যোৎস্নায়

ওই হাসি ওই অন্ধকার

জহর সেনমজুমদার

গ্রহঘর

এই কান্না। নবীন রঙের প্রাণী। স্তব্ধতার ভিতর
এক প্রসন্নতা। ঘরের দাওয়ায় প্রণামগুলি শুয়ে।
নূতনপক্ক আনন্দ-প্রণাম। দুধ-ভাত মেখে
আকাশকে খেতে ডাকছে মা। এই কান্না।
জলে জাগ্রত। কখনো ঘুমায় না বলে
লাঙলকে প্রাণী বোধ হয়।
দিবস-নিশীথ। পাতালপ্রবেশ।
আর চক্ষুমোহিত প্রদর্শনী ;
বলো আষাঢ়। কংকালের গণিকা। এই শুধু ইন্দ্রিয়ের
এই শুধু শূন্যপূজার তন্ময়তা।

অভাবপূজা

সকলে মিলে অভাব কুড়াই ; সকলে মিলে কান্না।
মৃত মায়ের ধানশিস উড়ছে আকাশে ;
পূর্বপুরুষের খোলা মাঠে মোরগসন্ন্যাসী।
এইবার রাত্রির পা ধরে প্রাণ।
অভাবপূজার পর পাঠশালায় এসে
ঘুম পায়। ঘুমের ভিতর শিক্ষিত মাটির প্রেরণা।
এই পথ প্রত্যহ। এই পথ নিঃশব্দ শিকড়ের ক্ষুধা ;
ঐ দাঁড়িয়ে সেই নিসর্গ-শিক্ষক
ঝরা পাতা ; মরা পাতা

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্ছেদ

উড়তে উড়তে কোথায় যায় এত ধুলো ? অভিশাপ ?

নড়ে উঠতে গিয়ে থেমে যায় আকাশ ঃ আজ মাঘপূর্ণিমা হলে
বেশ হতো। উপমাহীন চাঁদের নীচে শীত, হারমোনিয়াম....
যান্ত্রিক মোচড়ে বেঁকে যাচ্ছে বুলডোজারের ঘাড়। বস্তিউচ্ছেদ।
স্থির দৃশ্যপট থেকে ছিঁড়ে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে টিন আর টালি।

খানিক পরে আকাশ থেকে টুপ্ টুপ্ করে জল পড়বে

তারপর ফিরে আসবে ওরা, জোনাকিরা।

খেলা

কখন ভাষা পেয়ে গেল জোনাকিরা। অন্ধকারের এক একটা ঝাপটে
নড়ে উঠছিল গাছের স্মৃতি, এ ওর কানে ঘুরে ঘুরে খবর, হিহি হাহা
জলবন্দী মাছেদের গায়ের গন্ধ আসছে, আর কচি হলুদাভ ধানের জন্মস্রোত ঃ
আহা কালো, কালো জল, এই হাত দিলাম, হাত নিয়ে খাও

এই দুধদাঁত ক'টি, শ্যাওলা-জড়ানো মুখ....
সারাদিন গাছতলায় বালির ঘর, বালির ঢেঁকিশাল
পাথর দিয়ে হাতি, পাথর দিয়ে ঘোড়া

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

বাদুড়

হে কিরণ, তোমার কাছেই আজ পরামর্শ চাই
ভালো মন্দ যাই হোক কিছু একটা বলো
আগেকার মতো কোনও উপকণ্ঠ ভালবাসি না তো
তাছাড়া যুবার কাছে হাস্যকর হতে ভালো লাগে কার

হালফ্যাসানের নির্ভুল শরক্ষেপ থেকে বেঁচে গেছি আজ

হে কিরণ, জাহাজঘাটার গাঢ় প্রতারণা, পিণ্ডদানে রুচি নেই আমাদের

সুসময় এসেছে এখন।

মহাকাব্যের ৫

ওই ডানা ঢেকে দিচ্ছে বিশাল মহাদেশ
ওই বর্শার ফলক তার শ্বাসরোধকারী মহান সময়
ওই হারমোনিয়ামের রিড গির্জার মতো থমথমে অশ্রুপূর্ণ
ওই ধুলো নীরবতার জমা হয় জমা হতে থাকে
আর ওই হল তোমার অসমাপ্ত লেখা
যার জন্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোভ হয় আমাদের।

শবরী ঘোষ

নম্র সাম : জাগর-ভৈরব

স্বভাব ভালো না তোর। তাই তোর ওই মগ্ন হাত
সারাক্ষণ ছুঁয়ে থাকে কাঁটাফুলে বিদীর্ণ আমাকে।
আমি তোকে নিয়ে যাব কামরূপে, বাসন্তী উৎসবে—
কস্তুরী নাভির গন্ধে সুবাতাস যেখানে মাতাল ; সেইখানে,
লীলাবতী হরিণীর যূথে, যথার্থ বুঝব, তোর চরিত্র কেমন !

থাক।
স্বভাব-চরিত্র আমি অনেকের অনেক জেনেছি। কি হবে
অধিক জেনে বল ? নিহিত গভীরে আজ করি অনুভব—
ওই আলোর আঙুল ছুঁয়ে গেলে, সোনার কদমফুলে ভরে যায়
বসন্ত-বিরূপ এই শান্ত বনতল ; আচম্বিতে, পরিত্যক্ত দিলরুবায়
বেজে ওঠে—আনন্দ-বিনম্র সাম : বিকশিত জাগর-ভৈরব !

ইছামতী

ওখানে যাব না আমি জীবনে কখনও।

ওখানে দিয়েছে ডাক দূরগামী জাহাজের আধো-চেনা বাঁশি :
সাদা বিছানার মত পরিপাটি পাতা আছে ফেনময় সোহাগ-সাগর
অপেক্ষায় ব্যগ্র আছে কামগন্ধা কুসুমের খরতর তীর আমিষাশী
ওখানে উঠবে জ্বলে অন্ধকারে, খড়-কুটো পোড়ানোর সুতীব্র চাঁচর।

ওখানে রয়েছে ভয়, সুন্দরবনের আড়ে রঙ্গময় বাঘের মতন
ওখানে রয়েছে ঘন আনন্দের মধুময়-কৌতূহল-নিরসন চাবি ;
ওখানে কুসুমগর্ভে রোমাঞ্চিত বজ্রের স্নেহমদ অমৃত সেবন
হয়ত নিষাদ ফেরে, কাঁধে নিয়ে লৌকিকের গন্ডীবদ্ধ তীক্ষ্ণাশর দাবি !

ওখানে যাব না আমি কখনও জীবনে
দেবতার শেষ বর চিরদিন অ-প্রার্থিত রেখে দেব হাতে
আমরা ওখানে যাব লক্ষবার একত্রে দু'জনে
আমরা ওখানে যাব প্রতিদিন, অবন্ধন ইচ্ছার-নৌকাতে !

বিশ্বনাথ গরাই

কৌমার্য

অবিবাহিতের অন্নে দিগন্ত সবুজ
ফলে শস্যভিখারীর কূজন শুনেছি

সংখ্যায় অনন্য এই ঘোর বেনো মদ
পান করি কিন্তু পেয় কখনোই নই

শাখা জুড়ে বিদ্যালয়, প্রভূত জানালা
এখানে আকাশ ছিন্ন, মৌন তারাদল

ভাত

মাটির প্রণয়ে প্রাপ্ত এই তাপ, ঘন দুর্বাদল—
ডাক দিলে, অন্তহীন, ছড়াবো সংত্রাস !

দিয়েছো অগ্নির সাক্ষ্য, শান্ত পুণ্যফল—
রিক্তহাতে বর্ণমালা, মুখরিত আশ্চর্য ভূগোল ;

পাঠশালা দিকে দিকে, পিতৃঋণে কি বা এসে যায়—
বাঁদিকে ঋতুর স্বর, ডানদিকে রাশি রাশি জুঁই

সংভাই, কাছে আয়, মিলেজুলে শুই—

প্রমোদ বসু

বলিনি

তোমাকে বলিনি, আমি এখন সিং-দরোজায়
মাথা উঁচু করে আছি।
বিপ্লব যদি ভুল করেও এসে পড়ে,
তবে আমিই প্রথম তার ঝাঁকিয়ে দেবো মুঠি।

দরোজা হাট করে খোলা।
উঠোনে চাঁদোয়া খাটানো, তাকিয়া ফেলা, বিশ্রাম প্রস্তুত।
দালানে শাঁখ-বাজিয়েরা দাঁড়িয়ে।
একবার সপ্তকে চেঁচালেই হলো,
অমনি খানখান কলরবে স্বাগত জানানো হবে তাকে,
মালা পরানো হবে, চন্দন লাগানো হবে,
পারলে, মেয়েরা উলুও দেবে।

অবশ্য, যদি সে শেষমেশ এসে পড়েই !

রাস্তা জুড়ে আছে ঝাঁকরে-পাথরে।
মিথ্যে কথার তোড়ে সেসব সরানো যাবে না, শোনো !
এখনও আলো জ্বলেনি কোথাও, সাক-সুতরোও বাকি,
শুধু বুজরুকির অন্ধকারে তোমরা এনে ফেলতে চাইছো তাকে !

এত কৌশলে কাজ কী ?
স্রেফ হাত বাড়িয়ে দাও হাতে, গলা মেলাও একরকম স্বার্থে।
রঙ ভুলে যাও, বর্ণ ভুলে যাও,
মানচিত্র বড় করে আঁকো।
তারপর সততায় ডাকো, ব্যাকুল আব্দারে ডাকো,
একে অপরের চাহিদায় ডাকো,
ষড়যন্ত্র নষ্ট করে ডাকো।

বিপ্লব না এসে যাবে কোন্ দিকে ?

তোমাকে বলিনি,
এরা লড়াইয়ের মধ্যিখানে ভিত্ গেড়েছে মিথ্যের !
শক্ত মুঠির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে লোভ,
প্রত্যেকটি হাত ও কব্জিকে করে ফেলেছে স্বার্থপর, কুটিল!
এরা পারবেই না কখনও তাকে ডেকে আনতে।

আমি জানি, কোনও রাস্তা দিয়েই এসে পৌঁছবে না সে,
যতদিন না মানুষ নিজেকে 'মানুষ' করে।

বলিনি। একথা আমি কাউকেই বলিনি।

এখানে

এখানে খরশান অন্ধকার, ওখানে এখন আলো জ্বলছে কাদের ?

সমস্ত দিক থেকে ছুটে আসছে কারা ?
সমস্ত দিক থেকে ছুটে যাচ্ছে কারা ?
হ্যারিকেনের পিছনে টর্চ, টর্চের পিছনে হ্যাজাক,
হ্যাজাকের পিছনে আগুন-রাঙা মোমবাতি।
তারও পিছনে অজস্র চোখের চাউনি—গাঢ় অন্ধকার !

এক চিলতে পথ তিন টুকরো হয়ে যেখানে
ছারখার করেছে হাঁদিশ,
ত্রিলোকের সেই মাঝবিন্দুতে কারা যেন ফেলে রেখে গেছে লাশ—
মুখ-উপুড়-করা এক জন্মের লড়াই !

সনাক্তকরণের কোনও ঝক্কিই নেই।
কেননা, প্রত্যেকেই বলছে, 'এ আমারই মরণ।'
দৌড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে ওই ঘাতক ষড়যন্ত্র।
কাজ হাসিল-করা আনন্দে আলো জ্বালছে তারা পাড়ায়-পাড়ায়,
পতাকা ওড়াচ্ছে, নিশানা বানাচ্ছে।
চিৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছে—
তারা আসবে, মারবে, চলে যাবে।
প্রতিবাদ করলে ঘাড় দুমড়ে দেবে।
পুলিশ ডেকে আনলে, টাকা দেবে, মেয়েমানুষ দেবে।
তাড়া করলে, আড়াল হবে রাজনীতিতে।
সুতরাং করবার কিছুটি নেই।

ওখানে দপ্‌দপ্‌ করছে আলো, এখানে ভয়ার্ত, থির অন্ধকার।
উপুড় হয়ে পড়ে আছে আমাদের প্রত্যেকের লাশ ;
লাশ নয়,
মৃত সংগ্রামের গা-গোলানো গন্ধ।

তীর্থঙ্কর মৈত্র

দোয়েলদের খুকি যদি···

দোয়েলদের খুকি—
আজ যদি ডুমুর পাতার উপর জ্যোৎস্না ঢেলে দি....
আজ যদি বুন্তে বুন্তে রুপো গলা ঘাম তুলে দি রাতের ?
যদি তোমার পালকে চাঁদের হরণ পাঠাই সে চুপি ?
যদি ঘুম না পাঠাই ? যদি জাগরণ ছুঁড়ে মারি চোখে....

দোয়েলদের খুকি—
যদি এ ডানার নীচে একখানা মেঘ, সাদা মেঘ লুকাই ?
যদি চোখের এ নীলে ফ্যানা আর শংখ তুলে তুলে ধরি,
যদি বালু, ঝাউ রাখি, পলকের নীচে সমুদ্র পাঠাই....
যদি ভিজে পোশাকের যুবা রাজহাঁস উঠে আসে তীরে ?
তা হ'লে ? তাহ'লে ও কী দোয়েলদের খুকি, আজও—
কাউকেই ভালোবাসবে না !

সে প্রকাশ একা

একদিন জেগে উঠে তীরে সমস্ত আলোক পিন্ড
মুখে তুলে লবণ লাবণ্য—চাইল তোমাকে। তুমি—
লাবণ্য লাবণ্য বলে আজ ঘুম তৃষ্ণা ফেলে ডাকো।

তাকে সব তুলে দাও হাতে, সে তোমার মুখে মুখে
সুন্দর শোভন প্রাণ পায়। তোমাকে ছড়ায় দেখো।
দেখো উপমা, তুমি গাছে—তুমি পাতায় মেলেছ।
তুমি সমুদ্রের কিছু জলে, তুমি মাধুর্যের ফুলে
জগৎ জগৎ ধরে হাসো। আজ সে প্রকাশ একা !

আজ সে প্রকাশ ভেসে যায় ! তীরে এসে টেনে তোল তাকে।
তীরে এসে বলো, সে শোভন তোমার-ই জন্য ডুবে।
যে প্রকাশ তোমার-ই মুখে লাবণ্য লাবণ্য আজ।

তাপস রায়

ক্রোধ

দিনে দিনে বেড়ে ওঠে ক্রোধ
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে কাম

আমি সুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল
হয়ে বেরোব জেনো একদিন

আজো তাই স্থির নই আমি
খারাপ পথে পথে ঘুরে

খুঁজে দেখি কারণ আমার
কেন ঘুরি সাতাশ বছর ?

ষড়যন্ত্র

শরীরের ষড়যন্ত্র বুঝিনি এখনো
কিভাবে নামায় আমাকে খুব নীচুতে

আমি নেমে যেতে যেতে বুঝি জলস্রোতে
ভেসে যায় চোরাকুঠুরি, তারপর

অপরাধবোধে ভেসে যাই আমিও
ভেসে যায় দেখি আমার কৌমারকাল

অরুণাংশু ভট্টাচার্য

ব্রহ্মরাক্ষস

ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে নিচে
পড়েই গড়িয়ে যাচ্ছে ভাইবোন, দয়ার শরীর
বিধুমুখ বিধুমুখী মাসিপিসি উঠছে সারা গায়ে

নির্নিমেষ লক্ষ করি কাকে খাব, কাকে আমি জলে
ছেড়ে দেব—ও বাবারা আমচুর দেবানি এস এস
হাঁটতে পারি না আমি কল্মাষপাদ, এই পোড়া
পা দুখানি নিয়ে খুব ধীরে হাঁটি ব্রহ্মরাক্ষস

প্রতিবার হাতে তুলি, তুলে ভাবি—খোক্যাডা কাদের ?
একে আমি ছেড়ে দিই যদি ভবিষ্যতে কবি হয়
যদি বলে সেই কথা যে কথা পৃথিবী জানে না—
নাঃ—খেয়েই ফেলি, ব্রহ্মপাপী আমার কী দায় !

তারা সব চিত্রবৎ এর ঘাড়ে ওর পা, মাথায়
চিবুক স্থাপন করে জ্ঞানহারা ভাই-বোন-ছেলে
আমাকে ভেংচি কাটে, কে বাবা কী নাম তোমার
আমি শুধু খেতে থাকি, দয়াপদ ব্রহ্মরাক্ষস

খেলা

কে যেন কাষ্ঠের পুতুল হয়ে দাঁড়াল সমীপে
বললাম—কে তুমি ভাই ?
—তুমি কে হে ভাই বলবার ?
ভাই বলে ডাকো যদি দেবো গলা টিপে

উঠে আসে বিছানায়
শুয়ে পড়ে, লিঙ্গ নাড়ে চাড়ে
বলে ওঠে—কই বাবা কোথা গেলে ধর্মভাই
এসো দেখি পাঞ্জা লড়ি কে জেতে কে হারে !
—আমি খুব রুগ্ন ভাই তুমি শুয়ে থাকো
আমি চলে যাই ঘরকোণে
—ওসব হবে না চাঁদ বিছানায় ওঠো
দ্যাখো আজ, কী খেলা খেলিব তব সনে

উঠে পড়ি, যে মুহূর্তে স্পর্শ করি তারে
খসে পড়ে বল্কল আমার পীতজ্বর ছাড়ে
কেউ নেই বিছানায় গুটি গুটি হামা দেয় মন
কী খেলা খেলছ প্রভু, মনোমাঝে, কী খেলা খেলিছ অনুক্ষণ ।

প্রবীর ভৌমিক

নদীর নিকটে

নদীর নিকটে মানুষের মতো শুয়ে আছে লোক—
মানুষ কখনো নয়
হয়তো সাদৃশ্য আছে কোনো ।
কিন্তু তিনি লোক
পারে শুয়ে সর্বস্ব দিলো না ।
জল এসে ছুঁয়ে গেছে তাকে ।
ছুঁয়ে দেখে অস্থির শূন্যতা ।
দেখে ফিরে গেছে—কখনো আসবে না আর ।
ঐ হিম, ঐ স্থবিরের পাশে নক্ষত্র বসেনি ।

ঐ স্মৃতিহীন শব
উঠে বসবে ঠিকই
কিন্তু তিনি লোক
মানুষের সাথে হয়তো সাদৃশ্য আছে কোনো।

খোঁজা

কখন দেখা অপরিসীম তোমার সাথে
সেদিন ছিলো বৃত্তাকার আলো
প্রান্তরে সুখ মেলায় বুঝি অধিক রাতে
আমায় বুঝি বাসতে খুব ভালো।

ভালোবাসার এইখানে এক বিশুদ্ধতা
আজন্মকাল বুকের ভিতর সংগোপনে
রাখতে গিয়ে পাথর ব্যথা, পাথর ব্যথা
তোমার সাথে অপরিসীম তখন দেখা।

রাত্রিদিন খুঁজতে যাই খুঁজি
কখনো তুমি কোথাও ছিলে বুঝি।

খোকন বসু

আয়ওডিন

ঠোঁট ডুবে আছে আয়ওডিনে, তা থেকে বেরিয়ে আসছে ভাঙ্গা
মেটালিক ভায়োলেট, খান খান পড়ে আছে ঘাসের মাথায় নুব্জ শিশির—
সরে এসো ঠান্ডায় ঠোঁট জমে থাকে, আলোয়
পুড়েছে বলে এই বেগুনি ইনফার্নোতে মুগ্ধ ডুকে থাকা, ক্লান্তিকর বেশ্যাকুমারী
তোমার হাতের শাঁখা ও পলা দাও, খুলে রাখি গিল্টল নীল বরফতলা
যেন দূর প্রজাপতি পাওয়া এই মলিন কান্নায় মরে—
দ্যালাক্রোয়া ফুলের রঙে এ কান্নার মহামায়া জয় হোক অফুরান

ঘৃতকুণ্ড

কপালে ভস্মটিপ, তুমি কোন্ জটাবর্তী লাল ভৈরবী
নৃসিংহ পুকুরের জল নিষিক্ত করেছো উষ্ণ রক্তপাতে
এই এতো ওষ্ঠলাল, আঠামুখ, গোলাপীর সুমগ্ন কৌতুক
রুদ্রাক্ষের ফুল পেড়ে কাকে দেবে একদিন তমসবেলায়
দেওয়ালে উনোনো তার বাসিসুখ
দীপ ভালো ভস্ম ভালো উদ্ধত খোলা দীপাধার একেলা
ফুল নয়, তুমি জানো ঘৃতকুন্ড ঘর্ষিত অগ্নিঅভিলাষী

সুদীপ্ত মাজি

কোলাঘাট ১৯৯০

আলপথে উড়ছিলো শন্‌শন্ কবিতার ডানা
আমি ও তরুণ তাকে ছুঁতে গিয়ে হন্যে বাতাস
রঙের মিনারে উঠি, শিকাগোর রাজপথে নামি
শুধু তার খোলাচুল ছুঁয়ে ফেলে ভারী হা-হুতাশ

আলবেনিয়ার ক্ষেতে শণবুড়ি বাঁধছিলো চুল
দু'চার সখা ও সখী ঘিরে বসে তার চারিপাশে
কবিতার ডানা এসে সখীদের কাঁপিস ভাঙ্গে
অভিমানে আমাদের চোখের জানলা জলে ভাসে

চোখে ভাসে মুখে ভাসে শব্দের এ কি মায়াজাল!
অনেক ছোটার পরে বসে পড়ি আমি ও তরুণ
শ্বেতপরী বহুদূরে শেফালীর বিরল মুকুল
আমাদের হাতে জোটে নাসিকার বদলে নরুণ।

সন্‌জয় ভট্টাচার্য

দহন

ছবি পুড়ছে। দগ্ধ বুকে
দাঁড়াতে পারছি না।
তুমি বললে, সত্যি মাটি
ভরসা কোরে, যেই রাখলাম পা
কোমর থেকে নিচো অব্দি
হদিশ পাচ্ছি না।
তুমি বললে, তলিয়ে দেখো
আমি তখন দেখতে গিয়ে
আগুনে পুড়ে খাক! সর্বভুক, সর্বভুক
আমাকে পাচ্ছি না!!

অমিত আদক

পঙ্গপাল

বর্ণাক্ষর মাঠ কে দাপিয়ে গ্যাছে কালরাত
দৃষ্টিভ্রমে দেখা যায়নি কিছুই—এখন
অশ্রুক্ষুরে ভরে আছে জমি

অন্ধকূপে শব্দ ওঠে
হাওয়ায় বাজতে থাকে পাতা
গর্জনের ঢেঁকুর উগরে প্রকীর্ণ জট খুলে
রোদ খায়—ভৈরবী

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

সহজ পাঠ

এটা একেবারেই ভুল। এটা একেবারেই ঠিক নয়।
পরীক্ষা ভালো হয়নি। মন্দ হয়েছে তা-ও বলা যায়-না।

অর্থাৎ হ্যাঁ-ও না, না-ও হ্যাঁ, অর্থাৎ মরীচিকা
ও, ওকে বলে মরীচিকা

বাহ্, বেশ বুঝেছো। ওই দেখ বাঘ।
গায়ে যার ডোরা কাটা।

ও ডোরা কাটা হলেই সে বাঘ? কী মজা
আমিও ডোরাকাটা হয়ে বাঘ হবো।

কেন তুই বাঘ হবি? আমি হতে পারি না?
কেন তুই বাঘ হবি? আমি তো আগে বলেছি

ধাঁইদুমফটফটাফট্ দুমাস দুমা দুম দুম
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর নাদ নাদিছে

বেশ বেশ দুজনেই বাঘ হবো
তুই বাঘ হ, আমি বাঘের বউ।

মৃণাল মোদক

কেউ জানতেই পারে না

কোথায় যে কিভাবে শুরু হয় কেউ জানতেই পারে না
আস্তে আস্তে সব কিছুই পালটে যায়
টকটকে লাল পথ চোখের সামনে গলতে থাকে
পথ গলে স্রোত হয়
আভাকাঁপা অন্ধকার থেকে একটা আলো শুধু ছিটকে আসে।

কোথাও কি গড়ে ওঠে কিছু ? পূর্ণ হয় ?
পৃথিবীটা আশ্চর্য নীরব হয়ে মৃত তারার মত জ্বলে ওঠে
জীবন্ত গাছগুলি দৌড়ায়, আরো টাটকা লাগে
বিশাল সব গাছ, গাছের ভিড়ের আগুন
গাছ থেকে গাছে খুঁজতে থাকে
সে কি পোড়া তলপেট না আগুনের লিঙ্গমণি ?

চরাচর জুড়ে আগুন—আগুন মুক্তস্রোত
কে আছে এখানে এই দগ্ধ সহবাসে ?
কাঁচের চুড়ির মত সমস্ত কথা আজ ভেঙে পড়ে
রক্তাক্ত পথ ধরে কখনো হাড়ে বেঁধে
অর্থাৎ শুরু যে হয়েছে একথা বেশ বোঝা যায়
কিন্তু কোথায় কিভাবে
অন্তিম শেষের এই শুরু কেউ জানতেই পারে না।

সব্যসাচী সরকার

সঙ্গীত

চাঁদ উঠলেই রাতের নৌকো ঠেকে তাদের জাহাজে
নাবিকেরা হাত নাড়ে

নৌকোয় নেমে তারা নাচগান করে
মেয়েদের ডাক্তারী হয়

সক্কলে নেমে গেলে দেখা যায় ডেকে
একটি নাবিক একা গিটার বাজায়—

তার বউ পালিয়েছে অন্য জাহাজে

নেমন্তন্ন

তোমার বিবাহের নেমন্তন্নে যাচ্ছি
মা সম্পূর্ণ ট্যাক্সিভাড়া দিল,
বুকের প্রথম বোতাম খোলা, পতপত
চিন্তাশূন্যে পাঞ্জাবী উড়ছে
সেদিন যানজটহীন হু-উ-উ-স করে ট্যাক্সি যাচ্ছে,
ঝট ক'রে খুন চেপে আমি এক কচি পুরুষ
সদ্যোজাত নটেগাছ মুড়িয়ে দুলছি

শান্তিনিকেতনে জীবনের প্রথম মদ্যপান
কেউ বলেছিল, প্রথম প্রথম একটু তেতো লাগে
কলার কামড়ে মুখ টিপে
বিবমিষা সামলে নিয়েছি—

কাঁণয়া ফুটো করে বিষাক্ত অক্সিজেন ঢুকল
ট্যাক্সির কাচ থেকে ঝোলে মরা বেড়ালের ছাল,
ড্রাইভার বলল, বাইরে ছাই ফেলুন—
ছিঃ, এক কচি পুরুষ
তোমার বিবাহের নেমন্তন্নে যাচ্ছে

সানাই হুইসিল দিল বেলেঘাটা এসে গেছে
কমদামী শাড়ি বগলে কচি হেসে
নেমে আসছি, আজ রাতে
একটি নারীভূতকে আমি পাশব্যালিশ করবো
তার কোন সিঁদুর ছিল না—
এই সেই ঘুমহীন ক্ষমা, কোনদিন জেগেও থাকে না

পৌলমী সেনগুপ্ত

ম্যাজিক

মাঝপথে থেমে গেল বৃষ্টির দানা ছিল যত
গায়ে গায়ে লেগে থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিনগুলো
তাদের ফোকর দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে ঝোড়ো রাত ।
শুকনো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বুড়ো জাদুকর
দশটা আঙুলে তার প্রসারিত জ্যামিতিক ছবি
তার টুপি থেকে খসে পড়ে জ্যান্ত সব আগুনের বুটি
অযুত নিযুত তারা বারবার লুটোপুটি খায়
আমার শরীর জুড়ে ।

অযাচিত সেইসব রাতে
চলমান ছায়া থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া গান উঠে আসে
জাদুকর পেটে তার রকমারি লুকোনো ভেল্কি
কাটাজোড়া খেলা হয় সন্তানের ঘাড়ের উপর
আমার নিজের ধড়ে জুড়ে যায় অন্য এক মাথা
দুরন্ত শিশুরা কাঁদে—গড়িয়ে নামতে থাকে
কাগজে ফুলের স্রোত....

দূর থেকে কারা যেন আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে....

পরাজয়

তোমার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই
আমি গোপনে লিখে রেখেছি
থার্ড বেঞ্চের পাশের দেওয়ালে ।

তীর্থচিহ্ন আঁকা পথে হেঁটে যেতে ভালোবাসো তুমি ।
অসুবিধা নেই কিছু
সোজা এগোলেই পাবে আটলান্টিস
তবু তুমি ফিরে এসেছিলে

তোমার ছোটবেলার লাল মোজা
আর কৈশোরের সমরেশ বসু
কসাথিটা ট্যানথিটা সমস্যাগুলো
পেয়ে যাবে আমার পকেটে

তোমার পাশের বাড়িতে থাকে
কালিদাসের যে শিখরদশনা নায়িকা
তাকে তুমি শিখিয়েছো ফোরট্রান-কোবল
এবং মালিনী ছাদ, তা শুধু আমিই জেনেছি ।

সবই জানতাম,
তবু শেষ অবধি হেরে যেতে হল
যেদিন দেখলাম তুমিও লিখে রাখো
আমার বিষয়ে সব গোপন খবর
থার্ড বেঞ্চের অন্য পাশের দেওয়ালে ।

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

তিব্বত

রাস্তাঘাট ছিল গভীর নির্জন হলুদ ঝরাপাতা ঠান্ডা সরোবর
এবং শার্সিতে রোদের ফিস্‌ফাস্‌ রোমশ তৃণভূমি ভেড়ার বাচ্চারা....

আলতো পায়ে পায়ে শহর ঘুরিফিরি আলতো পায়ে পায়ে দৃশ্য মুছে গেল
দৃশ্য মুছে গেলে বৃদ্ধ লামা তার রুগ্ণ দুই হাত শূন্যে মেলে দেয়

এই কি সে সময় যখন মেঘে করে ফুলপরির দল মর্ত্যে নেমে আসে ?
জানি না কিছুই কেবল কারা যেন ওদিকে কবরের আড়ালে হেসে ওঠে

কে হাসে এইভাবে ? কে ডাকে কাছে আয় ? কৌতূহল নিয়ে পেছন ফিরি যেই
সমাধি ফলকের চোদ্দ হাত দূরে হঠাৎ খসে পড়ে বিকেল, শেষ আলো

শব্দের শুচিবাই

মল্লিকা সেনগুপ্ত

ভালো কবিদের শব্দ নিয়ে অনেক খুঁতখুঁতি থাকে। একটি সঠিক শব্দের অভাবে মাসের পর মাস কবিতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাসে করে কর্মস্থলে যেতে যেতে হঠাৎ সেই সঠিক শব্দটি উদ্ভাসিত হলে বাস থেকে নেমে বাড়ি ফিরে আসেন অনেকে, কবিতাটি লিখে ফেলার জন্য। স্বাভাবিক, 'বিদিশার নিশা' শব্দবন্ধটি ছাড়া চুল কেমন তা বোঝাই যেতো না। এই খুঁতখুঁতি তো অনিবার্য। কিন্তু কবিতায় কোন্ শব্দ ব্যবহার করা উচিত বা অনুচিত, এই মূল্যবোধের বিচারে জড়িয়ে যান অনেকে, কিছু কিছু শব্দকে অশুদ্ধ ধরে নিয়ে কবিতায় অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করেন, নিজে লেখেন না এবং যারা লেখেন তাদের কবিতাকেই অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবতে থাকেন। চিন্তা এই শুচিবায়ুগ্রস্তদের নিয়েই। তাহলে কি কবিতা শুধু ভালো ভালো মিষ্ট কথা তৈরি করার শিল্প? জীবনের বা সমাজের সুন্দর মুখটাই কবির চোখে ধরা পড়বে, অসুন্দর মুখটি দেখেও না দেখার মতো এড়িয়ে যাবেন তিনি? নাকি সেই সেই কর্কশ দিকগুলিকে অভিজাত শব্দের রাঙতায় মুড়ে ফেলতে হবে? শুকনো কাঠকে 'নীরস তরুবর' বলবার মধ্যযুগীয় কবিতা আদর্শে ফিরে যেতে হবে আমাদের? বাস ড্রাইভার বা মাছউলীর মুখের ভাষা কোন প্রবেশাধিকার পাবে না কবিতার অভিজাত সভায়?

"চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে
খিদিরপুরে ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি ঃ
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো" [সমর সেন, একটি বেকার প্রেমিক]

কবিতাটায় যদি কোন কোন ক্ষেত্রে আরও নরম ভাষা ব্যবহার করতেন সমর সেন, শুচিবাইগ্রস্তরা হয়তো স্বস্তি পেতেন। কিন্তু যে বিরক্তিকর কলকাতার তিনি পরিবর্তন

চান, তার ঠিকঠাক চিত্র কি ফুটে উঠত ঐ নরম শব্দে? সাধারণত কবিরা যখন রাগ, বিরক্তি বা হতাশার প্রকাশ ঘটাতে চান, তখনই কলমের ডগায় উঠে আসে ধারালো, অনভিজাত শব্দ ও অনুভাব। প্রেম বা ঋতুবর্ণনার জন্য প্রয়োজন না হলেও ক্রোধ বা নৈরাশ্যের ক্ষেত্রে এইসব শব্দ অনিবার্য হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ যখন শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার কথা লেখেন, তার কোন বিকল্প হয় না, যেমন অবিকল্প 'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুণ্ঠরোগী চেটে খায় জল।' এই দুটি ক্ষেত্রে ভাষা ততোটা অনভিজাত না হলেও তার প্রকাশ তীব্র ধাক্কা মারে অনভ্যস্ত পাঠককে। কিন্তু সেই ধাক্কা থেকে নতুন শক্তিমান এক কবিতার ভাষা তৈরি হয়, কবিতা এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে যা অনিবার্য। সবসময়ে যে অনিবার্য বলেই এমন শব্দ কবিরা ব্যবহার করেন একথা বললে অবশ্য অত্যুক্তি হয়। ধাক্কা দেওয়ার কৌশল হিসেবেও তরুণ কবিরা এমন কিছু শব্দ কবিতায় ব্যবহার করতে চান যা আগে ব্যবহার করা হয়নি, যা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে ধাক্কা দেবে। অর্থাৎ তথাকথিত আপত্তিকর শব্দ বা ভাব যখন কবিতায় পাওয়া যায়, তার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে, অনিবার্যতা ও কৌশলগত নতুনত্ব। দুটিই কবিতার ইতিহাসে জরুরি।

যারা ধাক্কা দেওয়া শব্দ ও ভাব ব্যবহার করেন এবং যারা ধাক্কা খান তাদের মধ্যে পার্থক্য রুচি ও মূল্যবোধের। প্রচলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক মাপকাঠি অনুসারে আমজনতার রুচি ও মূল্যবোধ তৈরি হয়। প্রচলিত চিন্তা, রুচি ইত্যাদি অর্থাৎ সুপারস্ট্রাকচারের সঙ্গে জড়িত থাকে প্রচলিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ আর্থসামাজিক বনিয়াদ। বহুদিনের অভ্যেস ও স্থিতিশীল সমাজের মধ্য থেকে কবিতার পাঠকের গড়পড়তা রুচি তৈরি হয়। সেই রুচিতে যারা সচেতন ও শিল্পসম্মতভাবে ধাক্কা দেন, তারা আসলে সেই প্রচলিত স্থিতিশীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে চান। গন্ডী থেকে বেরোতে চাওয়া সৃজনশীল মানুষের ধর্ম। সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি ধাপেই এই গন্ডী ভাঙার ধর্ম ছড়িয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিল্প বিচারের প্রথম মাপকাঠি হওয়া উচিত রচনাটি কতোটা শিল্পসম্মত সেটাই। দ্বিতীয় আরেকটি মাপকাঠি বোধহয় প্রতিটি পাঠকের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ করে—রচনাটি মানবতাবাদী কি না। অবশ্য কবিশিল্পীরা নৈরাজ্যবাদীও হতে পারেন, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় জীবনবিমুখতা কি শিল্পসম্মত হতে পারে? শিল্প তো সৌন্দর্যময় কোন নির্মাণ, ভাঙন যদি সৌন্দর্যময় হয়ও, তাকে কি শিল্প বলা চলে?

কবি যদি অনভিজাত শব্দ দিয়ে, এমনকি খিস্তি বা রকের ভাষা ব্যবহার করেও শিল্পসম্মত ও মানবতাবাদী কবিতা লিখতে পারেন, তাহলেও কি তাকে আমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো? একমাত্র এই অভিযোগে যে তিনি প্রচলিত ব্যবহারিক রুচিবোধকে

অতিক্রম করেছেন ? তাহলে তো সজনী দাসরাই জয়ী হবেন আর পরাজিত হবে কবিতার ইতিহাস।

আরেকটি ক্ষেত্রেও রক্তাক্ত অনভিজাত কিছু শব্দের ব্যবহার কবিরা করেন, প্রেমের চূড়ান্ত আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে। যে পাঠক নিজে সেই চূড়ান্ত আবেগময় মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকেন না, হয়তো তার পক্ষে সেই কবিতাকে সবসময়ে সদর্থে নেওয়া সম্ভব হয় না। তখনই কবিতাকে বলা হয় অশ্লীল। পাঠক ও কবির মধ্যে এই রচিত দূরত্ব কবিতাবিচারের মাধ্যম হয়ে ওঠে। কিন্তু কবি যখন লিখতে বসেন, এসব কথা ভেবে তো লিখতে পারেন না, তাঁর কাজ লিখে যাওয়া।

দাঁড়াবার জায়গা

ব্রত চক্রবর্তী

দাঁড়াবার জায়গা কমে যাচ্ছে। এর কাছে ওর। ওর কাছে তার। দিনকে দিন। এই সেদিন কলেজস্ট্রিটমুখো উদাস হাঁটছি। গা-ঘেঁষে গরম পা ফেলছে অল্পবয়সী একটি ছেলে। ফিল্ম নিয়ে পড়ছে। টুকটাক লেখে খবরের কাগজে। কথায় কথায় বলল, সে অমুকের কাছে কোন একটা ব্যাপারে পরামর্শ ও সহযোগিতা চায়, আমি যোগাযোগ করে দিতে পারব কিনা। ছেলেটি এত সরল ভঙ্গিতে তার অনুরোধ রাখল, বিমুখ করতে মন চায় না। কিন্তু আমি যে পরিষ্কার জানি ছেলেটির কাঙ্ক্ষিত 'অমুক' আমায় তেমন সুনজরে দেখেন না। ফলে ও-জলে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে কোন তরঙ্গ পাব না। ছেলেটিকে বললুম সেসব। ওর নরম চোখে হতাশার ছায়া পড়ল, নিচু গলায় বলল, তবু আপনারা কারুর কাছে গিয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা চাইতে পারেন, আমাদের সে সুযোগ নেই। গিয়ে দাঁড়াবার কোন জায়গাই নেই নতুনদের কাছে। কোথায় যে যাব !

ছেলেটি চলে গেল। গেল আমার বুকে একগাদা জিজ্ঞাসা চাপিয়ে দিয়ে। গেল ওর বয়সী হাজার ছেলের অসহায়তার পাহাড় সামনে রেখে আমার। শেষ কথাটা 'কোথায় যে যাব'-র হাহাকারে যেন আকাশ দু-ভাগ হল। হাওয়া থেমে গেল কয়েক-মুহূর্ত। এই নতুন বয়সে ও এই মর্মান্তিক সত্যটা জেনে নিয়ে পথ হাঁটছে। তেমন কেউ নেই—উদার নিরপেক্ষ আন্তরিক যার ছায়ায় গিয়ে দুদন্ড দাঁড়াবে। আর যদি দাঁড়াতেই হয়, সঙ্গে অন্য কারুর সুপারিশ দরকার এটাও ওর কম বয়স জেনেছে। আমিও তাই ভাবলুম। গাছের নিচে দাঁড়াব—কখন উপ্‌ড়ে তার শরীর বুকের ওপর পড়ল, জানি-ই না কবে তার শেকড় আলগা হয়ে গেছে। বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে সবে দাঁড়িয়েছি, তখনও ঘরে যাইনি তার—আমন্ত্রণের অপেক্ষা করছি, তার আগেই মাথার ওপর বাড়ি হুড়মুড়। জানি-ই না কবে ভিত আলগা হয়ে গেছে। ঘুন ধরেছে পছন্দের চুন-সুরকিতে। জানতেই পারিনি। নিজের অজান্তেই মুখ ফস্‌কে ছেলেটির শেষ হাহাকার পুনরাবৃত্তি করলুম ঃ কোথায় যে যাব !

সবাই জেনে গেছে। অগ্রজরা পছন্দ করছেন নির্বাচিত কোন তরুণকে, তরুণরা দলবদ্ধভাবে এক-এক দলের জন্য একেকজন অগ্রজকে তাদের দলবদ্ধতার মুকুট ভেবে নিয়েছে। এ ওর লোক, ও তার লোক, সে তার লোক, প্রত্যেকে এইরকম একটা জামা গায়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে। উপায় না দেখে। অথচ কোন উপায় জানে না এমন একজন, 'গুরু কাঙাল জানিয়া পার করো' এইরকম আকুলতা নিয়ে পারাপার চাইছে, এখনকার সমাজ তাকে

বোকাই বলবে। বোকা হতে আর কে চায়! নেহাত বোকা ছাড়া। তাই সবাই প্রথা জেনে নিয়ে চালাকের বাঁশিটাতেই একবার করে ফুঁ দিচ্ছে। সবাই বেশ চালাক। আমি অমুকের লোক এরকম জেনে গিয়ে আচরণ সে-ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে। শিবিরে ভাগ হয়ে গেছেন কবিরাও। দুই শিবিরের দুজন কবি বসে থাকা সত্ত্বেও সেই নিয়ম মেনেই কোন কথা না বলেই চুপ করে থাকে। মুখ খোলে যে যার তাঁবুর ভেতরে গিয়ে। ফলে পিঠের জামা সরিয়ে ভল্লের দাগ দেখাবার লোক কারুরই নেই তেমন। খুব দেখাবার ব্যাকুলতা হলে যে যার লোকের কাছে যায়। না যেতে পারলে জামা দিয়ে ভল্লদাগ ভাল করে ঢেকেঢুকে রাখে। পাছে দেখে কেউ হাসাহাসি করে, সেই ভয়ে।

'একজন কবি সবচেয়ে ভয় পায় / যখন তাকে সনাক্ত করার ভার / আরেকজন কবিকে দেওয়া হয়'!—কী মনখারাপের কথা। যেটায় সবচেয়ে স্বস্তির কথা হবার কথা ছিল, সেটাই সবচেয়ে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্রিকা দপ্তরে যখন কোন লেখক-কবি তার বই সমালোচনার জন্য দেন, তখন মনে মনে যে-কথাটি বলেন তা বোধহয় এরকম —বইটি যেন তার পছন্দসই কারুর হাতে পড়ে, বা তাকে পছন্দ করেন এমন কেউই যেন সমালোচনা করেন। কখনও তিনি সরাসরি উদ্যোগও নেন যাতে বিপরীত মেরুর, বা তার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ এমন কারুর হাতে বইটি যেন না পড়ে। সব্বাই জেনে-ই গেছে কে কার পছন্দের তালিকায়, এবং কে কার অপছন্দের তালিকায়। তালিকা তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন। সবাই ঘোষণা করছে তার পছন্দের লোকজনের নাম। এবং জানিয়ে দিচ্ছে বাদবাকি অপছন্দ। এবং তালিকাভুক্ত নন এমন যিনি, তিনি নিশ্চিতভাবেই জেনে যাচ্ছেন তালিকা তৈরি যার হাতে, তার কাছে কোন ব্যাপারেই গিয়ে লাভ নেই।

পারস্পরিক আস্থাহীনতার শ্রদ্ধাহীনতার এই শ্লোগান বাড়ছে, বাড়ছেই। কেউ কাউকে আর তেমন বিশ্বাসই করে না। কথা বলবার সময় ভেতরে নির্বাচন চলছে প্রত্যেকমুহূর্তে —এটা বলব না, ওটা বলা ঠিক হবে না, সেটা অমুকের অপছন্দ। আমি একটা কবি সভায় গিয়ে অবাক আহত হয়ে ফিরলুম দিনকয়েক আগে। গিয়ে দেখলুম অন্য কবিরা সবাই উপস্থিত। কিন্তু অধিকাংশের সঙ্গে আলাপ নেই আমার। নেই কিন্তু হতে কতক্ষণ। বারকয়েক ওদের পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করলুম, মুখই তুলল না কেউ। তারা সবাই একদলের, গোল হয়ে সোরগোলের। আমি কোন দলের নই, তাই তারা শক্ত চোখমুখ নিয়ে দেখল, তারপর উদাস আকাশ হয়ে গেল। কী দুঃখের কথা, তাদের কাছেই কবিতা পড়তে হল। একটি লোকও ইশারা দিল না ভাল বা মন্দ লাগার। বসেই রইল কঠিন হয়ে, আর অপেক্ষা করতে কখন তাদের পছন্দসই কাউকে কবিতা পড়তে ডাকা হবে। কবিসভা থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড়ে একটা রিকশোয় নিজেকে সঁপে দিয়ে প্রথম যে-কথাটা মনে হল—এতই যদি অপছন্দ, তবে ওরা ডেকেছিল কেন?

দিনকয়েক আগে আরেকটি নতুন ছেলে শুকনো মুখ করে এসে বসল আমার পাশে। নিজের ডানার ভারেই যেন ক্লান্ত। চুপচাপ। কথাই বলে না দেখে জানতে চাইলুম কী ব্যাপার। ছেলেটি নতুন লিখছে। সে গিয়েছিল তার কিছুটা অগ্রজ এক কবির কাছে। ঘন্টাখানেক বসে থেকে সে শুধু শুনেছে সেই কিছুটা অগ্রজ তার পাশের সঙ্গীর সঙ্গে এই আলোচনা করছে অমুকের দুর্বলতা কোথায়, তমুকের কি স্ক্যান্ডাল, অমুকের লেখা তমুক পত্রিকায় কোন্ চোরাপথে পত্রস্থ হয়েছে এইসব। এই নতুন ছেলেটি সেসব শুনে এতই হতাশ যে আর ওখানে যাবেই না ঘোষণা করে ফেলল। আমি কী বলব! ওর ক্লান্ত ডানার নরম পালকে মায়া-মমতার অল্প হাত রেখে বললুম, ভুলে যাও এসব। আর কী বলব? লজ্জায় আমারও মুখ নিচু। ও যার কাছে গিয়ে এতটা আশাহত, সে যে আমারই এক সমসাময়িক বন্ধু। ছেলেটি চলে গেল আমাকে একরাশ মনখারাপ দিয়ে। ভাবতে বসলুম আমার কাছেও যারা আসে, তারা যেন এইরকম আশাভঙ্গ নিয়ে না ফেরে। এ-ও এক কঠিন পরীক্ষা। এইসময়ে।

সবটাই কি তবে মরুভূমি? মরুদ্যান নেই একটুকরোও? আছে। গত বইমেলায় পিঠে হাত পড়ল এক বর্ষীয়ান অগ্রজের। ঔদার্য্যবশতই আমাকে আগে দিয়েছেন, পেছনে তিনি। কয়েক পা অন্তর লোকজন ঘিরে ধরছে তাঁকে, ফটোগ্রাফার শাটার নামাচ্ছে, তিনি অল্প দু-একটি কথা বা হাসি—এই বিনিময় করছেন। উচ্ছ্বাসের টেপ অনেক, কিন্তু তাঁকে শিকার করা মুশকিল। যেতে যেতেই বললেন, নিন্দা বা প্রশংসা দুটোকেই সমানভাবে নেবে। কোনটাতেই আপ্লুত হবে না। একটা কাজ করছ, সবটাকেই তার পার্ট অব দ্য গেম মনে করবে। লিখে যাবে, আর কখনই সুদে খাবার চেষ্টা করবে না। কোথাও কাঁটা বিঁধে ছিল বুকে, কোথাও। ইচ্ছে হল তাঁকে একবার দেখাই। এই সময়ে। বললুম লীলা মজুমদার একবার বলেছিলেন পঞ্চান্ন বছর বয়সের পর মানুষের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের এক উদারতা আসে। ছোটখাটো লাভ-ক্ষতি, ঈর্ষা, স্বার্থের ওপরে ওঠে। তখন কারুর জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় তার। সুযোগ থাকলে করেও। আপনি এটা মানেন? দুঃখের হাসি ফুটল সেই অগ্রজের মুখে, মুখ মামিয়ে বললেন, লীলা খুব চমৎকার লিখেছেন, কিন্তু দুঃখের কথা সব পঞ্চান্ন-র ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। হলে তো পৃথিবী অন্যরকম হয়ে যেত!

প্রতিকবিতার বীজে রাহুল পুরকায়স্থ

১

পুরাণ

প্রতারিত হলে আজ ঝরে যাবে সব মৃত্তিকা
এ'কথা ভেবেছি যেই চেয়ে দেখি কাছে আরো কাছে
দু'হাত বাড়িয়ে শুধু টেনে নিলে কবির স্বদেশ

ময়নাতদন্তের পর আপাতত এইটুকু
আরটুকু ক্রমশ....ক্রমশ....

৬-৩-৯০

২

সংকেত

তরঙ্গ পাঠাই আজ বাত্যাতাড়িত

অর্গল খুলে গেলে জাহাজের ভোঁ

অভিনন্দন জেনো টুপটাপ আলো ও আঁধার

নাবিকের চেরা হাড়ে সূর্যঘড়ি

খুব ভোরে ডেকে দিও রাত ১২টা

৩-৪-৯০

৩

সম্পর্ক

জটিলতা থেকে আলো ছড়িয়েছে কণা
এই তবে বিকিরণ, তেজস্ক্রিয়া!

পথে পথে লোকালয়, নিয়মমাফিক
মুখর বিদ্যুৎ পিঠে তাঁর জনতা

এইসব পার হয়ে আর কোনো দেশে
কোলাহল মিশে গেলে আরো কোলাহলে

বুঝে নিই ব্যবধান আলোকবর্ষ
দূরে আজ রচিতেছে তার ঘরবাড়ি
২০-৬-৯০

৪

অতিজীবিত

সমগ্র ধমনী জুড়ে সংকার ঢেউ তোলে
এমন মুগ্ধ দেশে কখনো আসিনি
সৌরমৃত্তিকায় ভাসে চন্ডালের শোক

পুঁথি পাঁজি শেষ হল
এবার যাত্রা শুরু মহানগরে
পতঙ্গ উড়ে এলো পলাশের বেশে
কবন্ধ বৃক্ষ ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়

হাওয়ায় দুলছে মাটি
ঘুম চিরে ছুটে গেল ইস্কুলবাস
আত্মহনন এসে অকস্মাৎ খুলে দিল জানলা-কপাট

এই ভোরে কথা বলে আমাদের মা
উপনিষদের মতো আরো কিছুকাল যদি বেঁচে থাকি
জানাব সেসব কথা বর্ণপরিচয়ে

জাগো হে পতনমুখী ভোরের হাওয়া
ধরো হাত চলো যাই খালাসিটোলায়

৫

একটি প্রেমের কবিতা

এইত সমাজবোধ এইত আঁধার
এইখানে ঘর বাঁধে মানুষের ছেলে
খায় দায় গান গায় খড়ের গাদায়
আগুন জ্বালিয়ে দেখে বহ্ন্যুৎসব

এইটুকু লেখা হলে উঠে এলো জল
জল উঠে এলো এই ছোট মহাদেশে
মহাদেশ ভেসে যায় জগৎপুরের
ছোট্ট যে কোঠাবাড়ি তার দরজায়
জেগে আছ যারা শোন গ্রীষ্মকালীন
অশ্রুর নিচে রাখা শামুকের ছানা
গুটি গুটি উঠে আসে শিরদাঁড়া বেয়ে
কয়লার স্তর বেয়ে স্বভাবসুলভ
নেমে আসে প্রাণবায়ু শহীদনগর
তোমায় বলছি জেনো আজ রাত্তিরে
ঘুম হবে ঘুম হবে পুরাতন ঘুম
রাতের সমাজ জানে এর বিনিময়

এইত সমাজবোধ এইত আঁধার
এইখানে গান বাঁধে মানুষের ছেলে
২১-৩-৯০

৬

১৯৯০

ঝড়ের চেয়েও আগে ঘরে ফিরে আসি যদি
খেতে দিও দুই মুঠো ভাত

এপিটাফ ভরা দেশে প্রতিকবিতার বীজ
শরীরে বহন করে ফিরি

আমিও তোমার মত হাসপাতালের রোদে
স্নাত হই যখন তখন

কামারশালার মেঘে ছুটে যাওয়া আলো গান
প্রণয়পরিখা জুড়ে বাজে

আমিও যে লিখে যাই অস্ত্রফলার বোধে
ডাকঘর : লালন ফকির
২৫-৮-৯০

ছ'টি অল্পশরীরী কবিতার বিনিময়ে একজন তরুণ প্রজন্মের কবিকে হাত ধ'রে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যে কতটা দুরূহ কাজ, কলম ধরতেই টের পেলাম। এ-ক'টি কবিতাই তাঁর কাছে প্রার্থিত ছিল, এবং তিনি সেই প্রতিশ্রুতি নিখুঁত হিসেবেই পালন করেছেন, সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে তিনি সম্ভবত তাঁর মাথায় এ সত্যটাও রেখেছিলেন যে যা দিচ্ছি ছোট পত্রিকার জন্যই দিচ্ছি, যেখানে পৃষ্ঠাবরাদ্দের আনুকূল্য খুব বেশি নয়; হয়ত এও, অল্পে গভীর হওয়াটাই জাত কবিকে সনাক্ত করে দেবে সুনিশ্চিত। মানতেই হবে, এ-সব ভাবনায় স্থিত থেকে কিংবা স্বভাবজ চারিত্রেই তিনি নিজের কবিকৃতিকে বেঁধেছেন শব্দের শাসনে, মিতব্যয়ী ভঙ্গিমায়।

ছ'টি কবিতার মধ্যে একটি ছাড়া বাকি পাঁচটিই তারিখ-নির্দেশিত। চতুর্থ কবিতাটাই সেই ব্যতিক্রম, রচনাকাল সেখানে অনুপস্থিত। হতে পারে এটা ঘটেছে অন্যমনস্কতায়, হয়ত-বা স্বেচ্ছায়। অসতর্কতায় যদি এই ভুল হয়ে থাকে, আমি মানি, সেটাই তাঁর কবিমানসিকতার একটি অভ্রান্ত পরিচয়। আপাদমস্তক একজন কবি অত টানটান সজাগ হলেই যেন কেমন বেমানান লাগে। ব্যক্তিগতভাবে আমি রাহুলকে জানি, কবিতামনস্ক একটি যুবক, সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ, তন্ময়; নিজের এবং অন্যের কবিতা-উদ্ধারে তাঁর স্মৃতি অনর্গল, তুখোড় এবং অব্যর্থ। আবার তাঁর আলুথালু অগোছালো ব্যক্তিত্বটাও নজর এড়াবার মত নয়। আর তারিখজ্ঞাপনে ভুলটা যদি স্বেচ্ছাকৃতই হয়, সে ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়টাও তো আমার। আমি এই সংবাদে রাহুলের চতুর্থ কবিতা থেকেই একটি পঙ্‌ক্তি তুলে দিয়ে ঋণী থাকতে চাই : 'কবন্ধ বৃক্ষ ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়।' অনুসন্ধিৎসু পাঠক এর অন্যতর ব্যাখ্যা নিজের সামর্থ্যেই খুঁজে নেবেন। নব্বুই সালের মার্চ থেকে অগাস্টের মধ্যে এগুলো লেখা, ধরে নিতে পারি তারিখহীন কবিতাটিও ওই সময়কারই। আবার নাও হতে পারে।

কবিতাগুলোর বিষয়ভাবনা ছাড়াও (সে আলোচনায় পরে আসছি) আঙ্গিক, পঙ্‌ক্তিনির্মাণ ও বিচ্ছিন্ন অনবদ্য কয়েকটি ছবির দিকে আমার দৃষ্টি চলে গেছে সর্বপ্রথম। দ্যোতনার সঞ্চারে যতিচিহ্নের কুশলী ব্যবহার উল্লেখ্য : 'ময়নাতদন্তের পর আপাতত এইটুকু / আরটুকু ক্রমশ....ক্রমশ....' (পুরাণ)। এ-ছাড়া, অন্য কবিতাগুলোয় যতিচিহ্ন প্রায় নির্বাসিত, বিসর্জিত। তৃতীয় কবিতার দ্বিতীয় ছত্রে একটি কমা ও বিস্ময়চিহ্ন এবং ষষ্ঠ কবিতার অন্তিমে একটি কোলন ছাড়া বাকি উচ্চারণমালা নিরাভরণ, পাঠের সময় ছন্দের স্বার্থে যেটুকু বিরাম জরুরী সেটুকুই প্রতিভাত হয়েছে যথেষ্ট বলে। এ চর্চিত সংযম তাঁর কবিতাকে প্রাকরণিক দিক থেকে অনেক ঘনবদ্ধ করে তুলেছে বিষয়ের অন্তরালে। শুধু শব্দ আর শব্দসংস্থানের নির্ভরতায় তিনি কবিতাময় আলেখ্য রচনা করতে পারেন নিপুণ শিল্পীর মত,

ঘুম হবে ঘুম হবে পুরাতন ঘুম

—একটি প্রেমের কবিতা

কোলাহল মিশে গেলে আরো কোলাহলে

—সম্পর্ক

ঘুম চিরে ছুটে গেল ইস্কুলবাস

—অতিজীবিত

খুব ভোরে ডেকে দিও রাত ১২টা

—সংকেত

'বারোটা'-র বদলে সরাসরি সংখ্যানির্দেশে '১২টা' উচ্চারিত হওয়ামাত্র কবিতাটির অন্তর্গত মিনতি যেন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কবিতারহস্যের এই ভেতরের ব্যাপারটা রাহুলের অজ্ঞাত নয়; আর নয় বলেই বাক্‌সংহত একটি ছোট্ট পংক্তির আয়তনে 'ঘুম' শব্দটিকে তিনবার প্রয়োগ করার মত প্রত্যয় ও সাহস তিনি সঞ্চয় করে নিতে পারেন অনায়াসে; কোলাহলকে মিশিয়ে দিতে পারেন গভীরতর কোলাহলের গূঢ়তায়, ইস্কুলবাসের শব্দকে অনুভব করেন তন্ময় ঘুমের শব্দহীনতায়। 'একটি প্রেমের কবিতা'য় প্রথম দুটি সংবেদী ছত্র অবিকল পুনরাবৃত্ত হতে হতেও হয়নি একেবারে শেষমুহূর্তে, শুধুমাত্র একটি শব্দের নিঃশব্দ সংযোজনায় অন্য মাত্রা সম্পৃক্ত হয়েছে গোটা কবিতার প্রেক্ষিতে। 'এইখানে ঘর বাঁধে মানুষের ছেলে' রূপান্তরিত হয়ে পরিবেষিত হয়েছে 'এইখানে গান বাঁধে মানুষের ছেলে।' অনুভবী উচ্চারণের তোড়েও যুক্তিসংহতি উপেক্ষিত হয়নি,—ঘর বাঁধার পরের পর্বেই তো গান বাঁধা। এবং এই 'বাঁধা' ক্রিয়াপদের প্রয়োগ এখানে দুটি ছবির মধ্যে দু-রকম মেজাজের অবতারণা ঘটিয়েছে, আমাদের বুঝে নিতে হয়। আমাদের এও বুঝে নিতে হয় একই সঙ্গে যে আলোচ্যমান ছ'টি কবিতারই অবস্থান যেন ঘুম আর জাগরণের মধ্যে, নিশ্চেতনা আর চেতনার মাঝামাঝি, অন্ধকার আর আলোর মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনায়ঃ

আমিও তোমার মত হাসপাতালের রোদে
স্নাত হই যখন তখন

—১৯৯০

অভিনন্দন জেনো টুপটাপ আলো ও আঁধার

—সংকেত

আর আলো-অনুষঙ্গকে ('সৌরমৃত্তিকা', 'এই ভোরে কথা বলে', 'কামারশালার মেঘে ছুটে যাওয়া আলোগান', 'নাবিকের চেরা হাড়ে সূর্যঘড়ি', 'জটিলতা থেকে আলো ছড়িয়েছে কণা', ইত্যাদি) ছাপিয়ে গেছে যেন এক রাত্রির অন্ধকার বিষণ্ণতা, এক যন্ত্রণাতাড়িত সমাজবোধ, এক চেতনাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তা,

১। এপিটাফ ভরা দেশে প্রতিকবিতার বীজ
শরীরে বহন করে ফিরি —১৯৯০

২। প্রতারিত হলে আজ ঝরে যাবে সব মৃত্তিকা —পুরাণ

৩। এইত সমাজবোধ এইত আঁধার —একটি প্রেমের কবিতা

৪। অশ্রুর নিচে রাখা শামুকের ছানা
গুটি গুটি উঠে আসে শিরদাঁড়া বেয়ে —ঐ

৫। সমগ্র ধমনী জুড়ে সংকার ঢেউ তোলে —অতিজীবিত

এবং বড় বেদনায় বেজে ওঠে '১৯৯০'-এর সূচনা পঙ্‌ক্তি: 'ঝড়ের চেয়েও আগে ঘরে ফিরে আসি যদি / খেতে দিও দুই মুঠো ভাত।' তবে ছ'-টি কবিতার মধ্যে আন্তরিকতম হৃদয়বান উচ্চারণ মুদ্রিত হয়ে আছে সম্ভবত 'অতিজীবিত' কবিতাটির শেষপর্বে, প্রত্যুষ-জননীর মন্ত্র-অস্তিত্বের সঙ্গে সেখানে মিলে গেছে শৈশবের আদিপাঠ: 'এই ভোরে কথা বলে আমাদের মা / উপনিষদের মতো আরো কিছুকাল যদি বেঁচে থাকি / জানাব সেসব কথা বর্ণপরিচয়ে।'

আরো একটি কথা। দু-একটি ছাড়া সব কবিতাতেই ঘুরে ফিরে আবর্তিত হয়েছে প্রাকৃতিক কয়েকটি উপাদানের অনুষঙ্গ। এসেছে মৃত্তিকার উল্লেখ, মাটির কথা, আগুন আর জল, ঝড় আর বাত্যা, বহ্নুৎসব আর মহাদেশ, বীজ আর হাওয়া, তেজস্ক্রিয়া আর বিদ্যুৎ, ঢেউ আর তরঙ্গ, আলো ও আঁধার। আদিমতার মূল থেকে, শিকড় থেকে রস নিঙড়ে এই কবি তাঁর বিষয়ের উপজীব্য সংগ্রহ করে নিচ্ছেন এইভাবে, এবং তাকে মুহূর্তেই চারিয়ে দিচ্ছেন মানবিক আবেগ-অনুভূতির অতল সম্পর্কে।

বিষয়ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে ছন্দে গ্রথিত সবচেয়ে উত্তীর্ণ কবিতা হল দুটি: '১৯৯০' আর 'একটি প্রেমের কবিতা'। নিখুঁত আবেগী পরিবেষণ। 'সংকেত'-এর তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রসারিত মাত্রাপ্রয়োগ ভারসাম্যের কোনো ক্ষতি করেনি। 'সম্পর্ক'-এর ছন্দও প্রেমের কবিতার অনুগামী ও টানটান। শুধু 'অতিজীবিত'-য় যেন একটু ছন্দপাতের আর মাত্রাস্খলনের সংশয় উঁকি দিচ্ছে: প্রথম ছত্রের ছন্দ-সংকেত কবিতায় অন্য এক নির্মাণ-সম্ভাবনার আবহাওয়া গড়ে তুলতে চায় নি তো?

কবিতার কবিতাধর্মে আস্থাবান ও উষ্ণ উচ্চারণের অধিকারী রাহুলকে আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন, ঐকান্তিক শুভেচ্ছা। আমি জানি এই কবিতাগুলি তাঁর শুধুই লৈখিক অনুভব নয়, এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তি তাঁর রক্ত থেকে জেগে ওঠা উপলব্ধি, অস্তিত্ব থেকে বেজে ওঠা বোধ। আসলে কবিতা তাঁর গলায় জমে-থাকা একটা আতুর অপেক্ষা, আর স্মৃতিনির্ভরতায় তাকে পাঠকের কাছে পেশ করা একটা স্বভাবজ পরিচয়।

—সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মরিস কারেমের কবিতা

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জন্ম : ১৮৯৯। বেলজিয়ামের কবি। কিন্তু লিখতেন প্রধানত ফরাসী ভাষায়। ১৯৭২ সালে ফরাসি লেখকদের এক কমিটির ভোটে তিনি 'প্রিন্স ইন পোয়েট্রি' নির্বাচিত হন। তাঁর আগে অন্য কোনও বেলজিয়ান কবিকে এইভাবে সম্মান জানানো হয়নি। কারেম অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির কবি ; তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয় যেন একটি মানুষের অনুচ্চারিত কথাগুলিও আমাদের কানে এসে বাজছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের গভীর অনুরাগী। তাঁর যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরেই ফরাসি সমালোচকরা বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, ইংরেজি তর্জমায় তার নাম 'সঙ্গস্ অভ্ বিগিনিংস'। শুনে 'প্রভাত সংগীত'-এর কথা মনে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মৃত্যু : ১৯৭৮। কবিতাগুলোর জন্য জো লান্‌টেলিম বেলথের ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

শিশুটি

শিশুটি যে কী নিয়ে খেলছিল,
কেউ তা জানে না।
কেউ তাকে এককোণে রেখে চলে গিয়েছিল
এক মুঠি সাদা বালি দিয়ে

কোনও-কোনও দিনে কেউ দেখতে পেয়েছে
শিশুটি পাখার মত ছড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত।
দৃষ্টি তার দূরে, বহু দূরে যেন নিবদ্ধ তখন
গম্বুজ-চূড়ার মতো।

কিন্তু সে এইভাবে চলে যাচ্ছিল কোথায়
যখন অন্যেরা ভাবছে সে তখনও সেইখানে রয়েছে ?
তা কি জানা সম্ভব নিজেরই তার কোনও দিন ?

যখনই সে বন্ধ করবে চক্ষু দুটি তার,
মস্ত একটা রাজপ্রাসাদে গিয়ে ফের ঢুকবে সে তখনই।
যে রাজপ্রাসাদ থেকে সমুদ্রকে পুরোপুরি দেখে নেওয়া যায়।

হাওয়া কথা কয়

হাওয়া কথা কয়, হাওয়া ফিরে-ফিরে আসে।
বন্ধুরা, বোলো না কোনও কথা।
আজ বৃষ্টি হবে, আজ তুষার পড়বে মনে হয়।
মুখের রেখাও পালটে যাবে।
হাওয়া কথা কয়, হাওয়া ফিরে-ফিরে আসে।
লঘু হৃদয়ের মতো কথা বলতে-বলতে ছোটে হাওয়া।
সে-স্বপ্ন মধুর হল, দীপ্ত হল আজ এই সকালবেলায়
যে-স্বপ্ন এবারে আমি দেখতে চলেছি।

ধূসর বাঁক

নদীর বাঁকের ধূসর রেখা ও
তোমার স্বচ্ছ পাখি,
বাতাসে তোমার ক্রমাগত শরনিক্ষেপ,
এবং তোমারই দীর্ঘ আলোর মাছের সাঁতার-লীলা।
দেখেছি তো তার ঊরু, তুমি তার চেয়ে
কিছু কম সুন্দর,
হাসির চেয়েও উজ্জ্বল কিছু কম।
এই সুন্দর রবিবার, এর মহিমা কোথায় জানি,
এর এই দীপ্তি কক্ষনো ফুরোবে না।

শিল্পী

সে একটা নদী আঁকতে চেয়েছিল ;
(আঁকা শেষ হতেই) নদীটা তার ছবি থেকে বেরিয়ে গেল।

সে একটা দোয়েল এঁকেছিল ;
(আঁকা শেষ হতেই) উড়ে গেল সেই দোয়েল।

সে এঁকেছিল একটা মাছ ;
(আঁকা শেষ হতেই) ফ্রেম থেকে সেই মাছটা হঠাৎ লাফিয়ে চলে যায়।

সে তখন একটা নক্ষত্র আঁকল ;
(আঁকা শেষ হতেই) দাউদাউ করে জ্বলে উঠল তার ক্যানভাস।

তখন সে তার ছবির মধ্যে
আঁকল একটা দরজা।
ভিতর থেকে আরও অনেক দরজা তখন
পরপর খুলে যেতে লাগল, আর
(সেগুলো পার হয়ে) দুর্গের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল সেই শিল্পী।

ভোরের কবি ফিলিপ জাকোতে

সুজিত সরকার

একথা কবুল করাই ভালো, এই শতাব্দীর ফরাসি কবিতার রাজ্যে যতবারই প্রবেশ করতে গেছি, ততবারই আমার মনে কাজ করেছে একধরনের ভয় ও দ্বিধা। কারণ, বর্তমান শতাব্দীর ফরাসি কবিতা ঠিক তাই, যাকে বাংলাভাষায় বলা হয় 'দুর্বোধ্য কবিতা', ইংরেজী ভাষায় বলা হয় 'আনরীডেবল্ পোয়েট্রি' এবং ফরাসি ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'লা পোয়েজি ইল্লিসিবল্'। কবিতা পড়ে আমি বিশুদ্ধ আনন্দ পেতে চাই। যেখানে কবিতা ধাঁধাঁরই নামান্তর, অকারণ বুদ্ধির ব্যায়াম, যেখানে কবিতা মানে নিছক শব্দলীলা আর আঙ্গিকমনস্কতা, বলা বাহুল্য, সেই কবিতার প্রতি আমি কখনোই আকর্ষণ অনুভব করি না। সুখের বিষয়, এক্ষেত্রে, ফরাসি কবি ফিলিপ জাকোতের কবিতা এক বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর কবিতা ভোরের আলোর মতোই স্নিগ্ধ, মৃদু, কোমল। ১৯২৫-এ যাঁর জন্ম এবং যুদ্ধোত্তর ফরাসি কবিতায় যাঁর আসন প্রথম সারিতে, সেই ফিলিপ জাকোতে প্রতীকী অর্থে নয়, প্রকৃত অর্থেই ভোরের কবি। তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে থাকে সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তের আলো, যা, জন লী কারের ভাষায়, 'দ্য রিলিজাস্ লাইট বিটুইন ডন্ অ্যান্ড মর্নিং'। প্যারিসের কলরোল থেকে বহুদূরে, পাহাড় ও উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত ছোট শহর গ্রিগ্নানের নির্জন পরিবেশে, শান্ত ছন্দে অতিবাহিত হয় তাঁর 'দিনগুলি রাতগুলি', খুব ভোরবেলা বাগানে ব'সে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের মতোই, সূর্য দেখবেন ব'লে ঃ

কে তখন গান গায় যখন সবাই চুপ ?
এমন পবিত্র কণ্ঠস্বর কার ?

শ্রোতার কথা না ভেবেই কে সে এমন গান গায় ?
কোথায় সে গান ? কাছে, নাকি দূরে থেকে ভেসে আসে
বরফ-ঢাকা লন পেরিয়ে ?

এ হ'লো ভোরের প্রথম রহস্যময় পাখি।
তুমি কি শুনতে পাও এই গান ?
বৃক্ষ খুশি হয় এই গানে, যেন বসন্ত-বাতাস,
আর সে নির্ভয়ে গান গায়, ধীরে ধীরে।
মৃত্যুচিন্তা নেই তার ? বলো, তুমি কি শুনতে পাও এই গান ?
মৃদু ভোরের আলোয় কী গান সে গায় ? কেউই জানে না।
শুধু তারাই শুনতে পায় এই গান
যারা চায় না জয়, চায় না অধিকার।

হ্যাঁ, ফিলিপ জাকোতে তাঁদেরই একজন, যাঁরা ভোরের প্রথম পাখির এই গান শুনতে পায়, 'যারা চায় না জয়, চায় না অধিকার'। অন্য আরেকটি কবিতায় তাঁকে বলতে শুনি ঃ 'আজ আমি জানি কিছুই আমার নয়— / এমনকি এই ঝরাপাতাদের সোনাটুকুও আমার নয়'। এক বিশুদ্ধ অনুভূতি থেকে, রামকৃষ্ণদেবের মতোই, নিজেকে 'অজ্ঞ' হিসেবে ভাবতে পছন্দ করেন তিনি। 'ক্রমশ বয়স বাড়ে, আরো বেশি অজ্ঞ হয়ে যাই'—এরকমও বলেছেন একটি কবিতায়।

'সুররিয়েলিজম্'-এর অবসান এবং 'এক্সিস্টেনসিয়ালিজম্'-এর সূচনা—এরই মধ্যবর্তী সময়ে কবি হিসেবে জাকোতের আবির্ভাব। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই 'ইজম্'-এর কম-বেশি প্রভাব তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। 'সাম্প্রতিককালের কোন্ ফরাসি কবির কবিতা দীর্ঘস্থায়ী হবে ?'—একবার এরকম একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁকে। উত্তরে তিনি উল্লেখ করেছিলেন এলুয়ারের নাম। এই এলুয়ারের সঙ্গে একটি ব্যাপারে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এলুয়ার বলেছিলেন ঃ 'আর এক বাস্তবতা আছে, কিন্তু তা এই বাস্তবতার ভিতরেই'। অনেকটা একই ধরনের কথা জাকোতের মুখ থেকেও আমরা শুনতে পাই ঃ 'সম্ভবত এই পৃথিবীর মধ্যেই রয়ে গেছে অন্য আর এক পৃথিবী'। এই অন্য পৃথিবীকেই জাকোতে গ'ড়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। তুচ্ছের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তুচ্ছও হয়ে উঠেছে অপরূপ, অসাধারণ ঃ

ছায়াময় পথপ্রান্তে, কাঁটাঝোপের ভিতরে,
দেখবে ফুটেছে অ্যানেমনি
উজ্জ্বল অথচ সাধারণ, যেন শুকতারা।

অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও জাকোতে রচনা করেছেন একটি গদ্যগ্রন্থ, যা মূলত একজন কবির ডায়েরি, সেখানে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনার পরিচয় টুকরো টুকরো টুকরো বাক্যে ফুটে উঠেছে, অনুবাদ করেছেন হোল্ডারলিন ও মন্ত্যালের কবিতা, আরো অনুবাদ করেছেন রিলকের কবিতা। এছাড়াও রিলকে বিষয়ে একটি আলোচনাগ্রন্থ লিখেছেন। জাকোতের কবিতায় রিলকের প্রভাব সুস্পষ্ট। নিজেকে 'রিলকেয়ান' বলতে ভালোবাসেন তিনি। রিলকে নিজেকে বলেছিলেন 'ইটারনাল বিগিনার', আর জাকোতে বলেন 'টু স্টার্ট ফ্রম নাথিং, দ্যাট্স্ মাই রুল'।

জাকোতের স্ত্রী চিত্রশিল্পী। 'ল্যান্ডস্কেপ' ও 'স্টিল লাইফ' অংকনেই তাঁর দক্ষতা বেশি। কিন্তু জাকোতের কবিতার সঙ্গে যে চিত্রশিল্পীর বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তিনি পিয়েরে টাল-কোট। তাঁদের দুজনের বাসস্থানের দূরত্বও খুব বেশি নয়।

টাল-কোটের ছবিকে বলা হয় 'লিরিকাল অ্যাবস্ট্রাকশন্'। এই ছবিতে বিষয় গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বস্তু, অনেকটা জাকোতের কবিতার মতোই। সম্ভবত জাকোতের সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ 'এয়ার্স্'। হাইকু-ধরনের ছোট ছোট কবিতার সংকলন। সমালোচক গ্রিগ্সন্ 'হাইকু'র একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন : 'শূন্যতায় কয়েকটি শব্দ'। টাল-কোটের অঙ্কনরীতিটিও অনেকটা এইরকম—সাদা পাতায় কয়েকটি কালির আঁচড়। 'এয়ার্স্' থেকে তিনটি কবিতা এখানে অনূদিত হ'লো (কবিতাগুলির আলাদা আলাদা কোনো নাম নেই) :

১. প্রবেশ না ক'রেই ধরতে পারো
এই আশ্চর্য আলো, যা, বন্দী হয়ে আছে
শীতের অরণ্যে ;
না, কোনো বহ্নুৎসব নয়,
না, শাখায় কোনো ঝুলন্ত লণ্ঠন নেই

বাকলে ভোরের আলো,
এই ভালোবাসা ফুল আনে, ফল আনে,
কুঠারের ঘায়ে স্পষ্ট বোঝা যায়
এ আলো পবিত্র

২. প্রতিটি ফুলই যেন ছোট রাত্রি
নিকটে আসার ভান করে

কিন্তু এর গন্ধ কোথায় যে উঠে যায়
সেখানে কখনো পৌঁছতে পারিনা
তাই ফুল আমাকে ভাবায় এত
তাই দীর্ঘ ব'সে থাকা
এই বন্ধ দরজার পাশে

যেখানে বর্ণের শুরু, যেখানে রূপের শুরু
সেইখানে দৃষ্টি আর পৌঁছতে পারে না

এই পৃথিবী অদৃশ্য ব্যাপক অগ্নির
শুধু অগ্রভাগটুকু

৩. ভার—পাথরের, ভাবনার

অসমান ভারসাম্য
স্বপ্ন আর পাহাড়ের

আমরা এখনও অন্য পৃথিবীতে বাস করি
সম্ভবত মধ্যবর্তী কোনো স্থানে

বিশুদ্ধ কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, জাকোতের কবিতা ঠিক তাই। 'কিছুই আমার নয়', 'কিছুই জানি না আমি', 'যেখানে কিছুই নেই সেইখান থেকে শুরু করতে চাই'—এই সমস্ত উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি তাঁর হৃদয়ের পরিশুদ্ধ আলো, পরিশুদ্ধ অন্ধকার। সহজ, নির্ভার তাঁর কবিতা, যেখানে ভোরের আলো ও সত্যের আলো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে :

আমি ব'সে থাকি ঘরে, চুপ।
স্তব্ধতা ভৃত্যের মতো সবকিছু পরিপাটি ক'রে দেয়।
আমি অপেক্ষায় থাকি, মিথ্যেরা ছড়িয়ে যায়।

'সাদা ও প্রতীকী' কবিতার চিত্রকল্পে রণজিৎ দাশ

সুভদ্র পাঠক

মামুলি ও চিরাচরিত পথ থেকে একটু সরে গিয়ে অন্য চোখে দেখা, পা ফেলা অন্য মাটির ওপর, বেছে নেওয়া নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ আর আঙ্গিক, সমসময়ের অবস্থানকেই আবিষ্কার করা নতুনতর প্রতিমায়, প্রত্যয়ে আর প্রকরণে,—কবিতার আধুনিকতা বলতে তো এও আমরা বুঝি। বিষয়প্রক্ষেপের মধ্যে যে অভিনবত্বের সঞ্চার, তার অনেকটাই তো হতে পারে চিত্রকল্পনির্ভর, উপমা-আশ্রয়ী, শব্দ-অবলম্বী। সত্তরের সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় স্বভাবনিপুণ কবি রণজিৎ দাশের কবিতায়, মানতে দ্বিধা নেই, এ সত্যটা এক অভ্রান্ত অভিজ্ঞান, তাঁকে শনাক্তকরণের এক নির্ভুল পন্থা। তাঁর কবিতায় পরিবেশনের মধ্যে যে এক পাঠযোগ্য চমৎকৃতি উঁকি দিয়ে যায় এবং উঁকি দিয়ে যায় বলেই তাঁর উচ্চারণে স্মরণীয়তার দাবি আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, তার অন্তত বহুলাংশই নির্মিতিসজাগ এক প্রাকরণিক মুন্সিয়ানা। তাঁর বিষয়ের ঔজ্জ্বল্য আর তীব্রতার অনেকটাই কৃতজ্ঞ তাঁর উপমানির্ভরতার সপ্রতিভ মেজাজের কাছে। এতটাই অন্বিত আর অত্যাজ্য তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প, চিত্রকল্পের দুর্লভ প্রযুক্তি। একই সঙ্গে এও স্বীকার্য, অনেক কবিতার বিষয়ের মধ্যেই ঝলসে উঠেছে বিস্ময়কর অসাধারণত্ব, তাকে অন্যতর মাত্রায় উত্তারিত করেছে এক-একটা শব্দ বা শব্দবন্ধ, এক-এক প্রতিমা, হয়ত বা একটা অদ্বিতীয় মিল কিংবা ছন্দের সম্মোহন,

সমস্ত বিছানা জুড়ে মেঘাচ্ছন্ন চুল, হাওয়া, চকিত বিদ্যুৎ,
নিষ্ঠুর বিরতি—যেন ওলটানো লরির পাশে শুয়ে আছে জাতীয় সড়ক

—প্ররোচনা

মশারি গোঁজার মতো সতর্কতা নিয়ে তুমি পাথরের নৈরাজ্যে এসেছো

—ভূমিকা

জল থেকে উঠে আসে সোনার কুঠার।
উজ্জ্বল প্রশ্নের মতো, ভোরবেলা, দিগন্তের পাশে

—স্মৃতিফলক

চতুর্দিকে উড়ন্ত অন্ধকার,
মুশকিল-আসান ফকিরের আলখাল্লার মতো

—ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া

উপমা এসব দৃষ্টান্তে এতটাই অনিবার্য আর অমোঘ, যে এদের খারিজ করলে ছবিগুলোর সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, প্রার্থিত আবেদন অনেকটাই শ্লথ হয়ে যায় পাঠকের কাছে।

অথচ সম্পৃক্ত জোটবদ্ধতায় যে সপ্রতিভতার জন্ম, সেখানেই নিহিত তাঁর বিশিষ্টতা, তাঁর বিশ্বস্ত চারিত্র্য। এবং চিত্রকল্পের এই অব্যর্থতাই তাঁকে বাক্‌সংযমী করে তোলে, শব্দবাসক করে তোলে অগোচরে ; প্রগল্‌ভ উচ্চারণ যে কবিতার স্পর্শপ্রবণ শরীরকে আহত করে দিয়ে চলে যায়, তার আঁচ থেকে নিজেকে প্রশ্নাতীত দূরত্বে অবিক্ষত রাখতে জানার বিচক্ষণতা বাঁচিয়ে দেয় তাঁর শিল্পিত স্বভাবকে। আরো বড় কথা, চিত্রকল্প নিয়ে তাঁর আতিশয্য নেই, অতিরঞ্জিত আয়োজন নেই এতটুকুও। ক'টি মাত্র শব্দের আঁচড়ে 'জিপসীদের তাঁবু'-র 'বাবাকে' কবিতায় তিনি জীবন্ত সম্বোধনে জ্ঞাপন করেন, কেন তাঁর বাবার অশিল্পীসুলভ সম্ভোগহীন জীবন তাঁর নিজের কবিতায় উষ্ণতা পেল না, বিষয় হল না 'ভাতকাপড়ের দুশ্চিন্তায়' গ্রস্ত সে অস্তিত্ব ; অনায়াস একটি উপমা তাঁর নিরাভরণ মীমাংসাকে যেন আরো মসৃণ আর সুসহ করে তোলে কবিতাটির একেবারে শেষ লগ্নে, 'আপনার কথা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। / আপনি আমার লেখার জগত থেকে একটু দূরে রয়েছেন, / যেমন শহর থেকে একটু দূরে থাকে পাওয়ার স্টেশন'। এই সঙ্গেই আমাদের খেয়াল করতে হয় 'একটু দূরে'-র এক চিলতে প্রয়োগ, যার সূত্রে আসলে অমেয় দূরত্বের দ্যোতনাই নির্ণীত হয়ে যায়। কিংবা 'বিশ্বাসকাকু' কবিতায় বিতৃষ্ণ বৈরাগ্যের যে সূচনা প্রথম ছত্রেঃ 'অর্কবিজীবন ছেড়ে একদিন চলে যাবো—যেদিকে দুচোখ যায়', আচম্বিতে তার একটা অভাবিত বাঁকের জন্য আমরা সজাগ থাকি না, অথচ সেটাই হাজির হয় ওই পঙ্‌ক্তিরই দ্বিতীয় পর্বেঃ 'সম্ভবত গড়িয়ার দিকে'। 'সম্ভবত' শব্দটির অনিবার্যতা আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। অথবা, প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনায় উপমাশূন্যতাই প্রগাঢ় উচ্চারণকে অর্থঘন কোন্ স্তরে পৌঁছে দিতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত,

মৃতদেহ কাঁধে তুললে কতোটা ওজন—তুমি এখনো জানো না

দুহাতে ছড়াও খই—লঘু শোক,

সাদা ও প্রতীকী

কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হয়ে ভাবো, খুব অংশ নেওয়া হলো

মৃতদেহ কাঁধে তুললে কতোটা ওজন—তুমি কিছুই জানো না —কবিকে

'কিঞ্চিৎ' ও 'খুব' শব্দের বিপ্রতীপ সংশ্লেষ স্মৃতির সম্পদ হয়ে থাকে সুবেদী পাঠকের কাছে ; 'এখনো জানো না' 'কিছুই জানো না'য় অবস্থান্তরিত হওয়ার সূত্রে ঠিকরে বেরিয়ে আসে কবির প্রকরণ-সচেতনতা। প্রতিমার প্রয়োগ আর অনিযুক্তির এরকম অসামান্য নজীর রণজিতের কবিতায় আকীর্ণ হয়ে আছে পরতে পরতে। চিত্রকল্প কখনো এসেছে, কখনো আসেনি, এবং যখন সে আসেনি তখনই যেন বেশি করে টের পাই তার সম্ভাব্য আর দীপ্ত উপস্থিতি, তীব্র অলক্ষ্য আভা,

ভীষণ রৌদ্রের মধ্যে তার দুটি উদাসীন চোখ
জেগে আছে বাসস্টপে

—হাতচিঠি

ঘুমিয়ে পড়েছে তার মাথা, ক্লান্ত পতঙ্গের মতো

—সবুজ সমীকরণ ২

একদিন রাত্রিশেষে, যখন বিধবা চাঁদ পা ছড়িয়ে নেমে এল তালবৃক্ষমুণ্ডের উপর

—পাতাল ভৈরবী

বিরামহীন গত দু'রাত ধরেই চলেছে এই মেঘের দল।
যেন ৪৭ সালের সীমান্ত পেরিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের মিছিল।
ঐ লম্বাটে মেঘটি আমার ঠাকুর্দা। ঐ দ্রুতগামী
মেঘটি আমার বাবা, ঐ পিছিয়ে পড়া ক্লান্ত মেঘটি আমার মা

—ইতিহাস

ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়ে বড়ীর হাত বারবার
পাখির ভারে বেসামাল কচিগাছের ডালের মতো কাঁপে

—নৈশ ফুটপাতের একটি দৃশ্য

তুমি

আর্ত চিতাগ্নি-র কাছে স্তম্ভিত দমকল। বুঝি তুমিই কর্পূর

—বিষাদ

শীর্ণকায় নারীদের শোকাচ্ছন্ন দ্রাবিড় আঙুল

—শার্লক হোমস-এর ভারত-ভ্রমণ

শুধু উদ্ধৃত বিচ্ছিন্নতায় নয়, পাঠকের কাছে আমার বিনীত আর্জি, উপমাসমৃদ্ধ ও উপমারহিত, এই দুই গোত্রের ছবিগুলিকে মিলিয়ে নিন রণজিতের উল্লিখিত কবিতাগুলোর সঙ্গে, সম্পূর্ণতায়, সমগ্রপাঠে, আদ্যন্ত। মিলিয়ে নিলে বোঝা যাবে আরোপিত বাক্-প্রতিমায় তাঁর রুচি নেই, চেষ্টিত চিত্রকল্পের জন্য তাঁর আর্তিও প্রকাশ পায় নি কখনো। যা চর্চিত হয়েছে তার পেছনে ছিল একটা তাড়িত অনিবার্যতা, সংবেদী সাবলীল মর্জি।

রণজিতের প্রিয় প্রকরণ দুই বিপ্রতীপ অনুষঙ্গের মেলবন্ধনে। প্রারম্ভিক প্রেক্ষিতকে এক ঝট্‌কায় প্রসঙ্গান্তরে বিবর্তিত করে তিনি বিষয়কে করে তোলেন ভিন্নমাত্রিক, এবং সে পদ্ধতিতে তাঁর সবচেয়ে বড় আস্থা স্মার্ট ভঙ্গিমায়, চিক্কণ ডিক্‌শনে, পরিপাটি বিন্যাসে। এই রীতির সার্থকতম নমুনা সম্ভবত 'ফেস্টিভ্যাল অফ ইণ্ডিয়া', যার সূচনায় 'আবছা শ্যামবাজার ঘিরে পদ্মা-মেঘনার ইলিশগুঁড়ি', মধ্যপর্বে 'পানিশ্যাওলা গ্রামের

মাথায় একফালি সংখ্যালঘু চাঁদ, যেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাক্ষী, যেন তৈমুরলঙের শুভেচ্ছা', আর অন্তিমে 'আর একটি বাঁক পেরুলেই মস্কো শহরতলি—বোয়িং কার্গোর নীল আলোয় কাঁপছে টোটেম—বোঙ্গা দেবতা।' অনুষঙ্গের দ্রুত পটবদল তাঁর প্রিয় টেকনিককে চিনিয়ে দেয় মুহূর্তেই। এই রীতিই অন্য ছাঁদে অনুসৃত হয় 'আপেল' কবিতায়ঃ 'আপেলে কামড় দিয়ে মনে হল, চতুর্দিকে স্যানাটোরিয়াম'; মুহূর্তে বদলে যায় চালচিত্র, দ্বিতীয় ছত্রেই স্মৃতির বিষয়ী হয়ে ওঠে 'স্বাস্থ্যের লাবণ্য, পাখি, টিলার ওপরে তেজী রোদ আর টাটকা বাতাস।—অভ্যাবিত অনুষঙ্গ।' 'অধ্যয়ন' কবিতায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুহূর্তেই রূপান্তরিত হয় মানুষের বিশ্বাসভঙ্গের এক উদ্ধত প্রতীকে, এবং সেই সূত্রে তাঁর চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয় 'বামনদের বিলুপ্তির ইতিহাস'; কিংবা 'আন্তর্জাতিক'-এ রকমারী বিদেশী উপহারে ঠাসা লতাপাতা আঁকা টিনের সুটকেশ নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয় নিছকই গ্রাম্য মেঠো পথে, জল-কাদায়,—সামনে অপেক্ষা করে নিঃসঙ্গ পাঁচ ক্রোশ হেঁটে যাওয়ার বিড়ম্বনা। শূন্যে ছুঁড়ে-দেওয়া চায়ের প্লেট কৌতুকছলে 'ফ্লাইং সসার' বনে যাওয়া মাত্রই, আরেকটি কবিতায় ('মন্তেশ্বরী মেথড'), আবহাওয়া বদলে যায় চোখের পলকে, হঠাৎ বিপর্যয়ে ত্রস্ত হয়ে ওঠে শান্ত গৃহস্থালি, এবং উদ্বিগ্ন পরিস্থিতি একটা মোক্ষম মোড় নেয় কবিতার শেষ লাইনে যখন ছেলের কানে কানে সঙ্গোপনে বলে ওঠে বাবা, 'ফ্লাইং সসার এলে গ্রহের প্রাণীরা ঠিক এরকমই আচরণ করে।' নিরুপম সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কোলাজ কবিতাগুলিকে প্রেক্ষিত পালটে অন্য চরিত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র জুটিয়ে দেয় এভাবেই।

এই রীতিরই প্রায়োগিক তালফেরতা চোখে পড়ে দেশজ শব্দ ও কথ্যভঙ্গির সঙ্গে আচমকা ইংরেজি শব্দের অনবদ্য মিশেলে। ইংরেজি শব্দের ব্যবহার রণজিতের কবিতায় যে খুব বেশি প্রাপনীয় তা নয়, কিন্তু উপলক্ষ্যবিশেষে তার যৌথ প্রয়োগ প্রায় বিকল্পরহিত। এমন মনোজ্ঞ মিশ্রণে তাকে এনে হাজির করা হয় যে বাংলা শব্দের থেকে তার পৃথক্‌করণ একান্তই অসাধ্য। আগের অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত 'স্যানাটোরিয়াম' শব্দটির গায়ে যে বিদেশিয়ানার গন্ধ ছিল, টের পাওয়ার আগেই ওর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমরা মুক্তমন হয়ে যাই, আর ঠিক এভাবেই আমরা সাক্ষী হই সমমেজাজী দৃষ্টান্তের,

ঘড়িতে নার্ভাস-মুখ—প্রেমিকার

—প্রথম ম্যাটিনি শো

একা একা, লুম্পেন শহরে
অজ্ঞাত জলের মতো বেড়ে উঠি

—তোমার বিপদসীমা

সেখানেও কত লোক জীবনে স্ট্যাগল ক'রে আজ বেশ প্রতিষ্ঠিত

—বিশ্বাসকাকু

আমি আবার চে'চালুম, কেন হেজিটেট করছেন আপনারা, কুড়িয়ে নিন,
টাকা

—ব্যাংক সভ্যতাকে
আমার উপহার

পুরোপুরি সেরে উঠলে ডিসচার্জড—

—নার্স

রণজিতের এইসব প্রিয় প্রকরণের পাশাপাশি নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখি : ওর প্রিয়তম চিত্রকল্প ও বিষয়ভাবনা কি ? একটা অনালোকিত অস্তিত্বের দিকে তাঁর চোখ ধাবিত হয় প্রায়ই, আসে অন্ধকার, মাছি এবং শিশুচোহিদা দিয়ে তৈরি অবৈধ খাটালের ছবি, রুগ্ন তাঁতকল, ঘুটঘুটে মর্গের চারপাশে ডোম-সন্তানদের উল্লেখ, অপ্রতিভ অন্ধ মানুষ, পলি জমে-ওঠা নির্মজ্জিত ঘর, ওলট-পালট গণিকার অট্টহাসি। আসে রোগযন্ত্রণার অনুষঙ্গে হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, নার্স, শীর্ণকায় নারী, কুষ্ঠরোগীর গুহা, বোবা পাগল, সদ্য-যুবা রুগীর মতো ওষুধে উদাস নিষ্ঠুর ভণিতা আর মৃত্যুশোক। চৌমাথার ভীড়, ভীষণ গাড়ির শব্দ, অনর্গল ফেনা-ভর্তি দুধে ভরে-ওঠা বালতি, চোরঙ্গি, টেরিটিবাজার, মেট্রোর গুহা, পার্কস্ট্রিট,—এসবের সমন্বয়ে শহর কলকাতার দৃশ্যপট ছোঁয়া থাকে এখানে-ওখানে ; জমা থাকে কিছু যন্ত্রণাও এর জন্যে, যে শহরটায় চাপ চাপ অন্ধকার মাটি ফেরি করে বেড়ায় ক্লান্ত উদাস বালকের দল। এ-ছাড়া ঘুরে ফিরেই আসে, বারেবারেই স্পর্শিত হয় সমুদ্রীয় সাহচর্য, অনুষঙ্গ প্রতিভাবনা,

কবে কোন্ পর্যটনে
নুলিয়ার শূন্যদৃষ্টি, সৈকতবালির মতো ঢুকেছিল আস্তিনে,

অতর্কিতে ঢিল ছুঁড়ে লবণাক্ত চুম্বনের ছবি
কেউ এসে ভেঙে দিয়ে গেল

—পর্যটন

তিনি নেই, ব্যক্তিগত গ্রীষ্মের ছুটিতে
সন্তানের হাত ধরে অজ্ঞাত সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেছেন

—যে অংক বুঝিনি

....সমুদ্রের ওপর ভাসছে শালপাতার স্কুলঘর

—ঝড়

নাবিকের হাড় দিয়ে
সন্ধ্যার উঠোনে তুমি
ভাঙা জাহাজের ছবি আঁকো

—সময়, সবুজ ডাইনি

সমুদ্রগুল্মের মধ্যে বিস্ফারিত প্রাচীন ঝিনুক
ডুবুরির উপকথা

—মিথুন পদাবলী

তোমার মিলন প্রস্তুতি যেন এক পূর্ণ জাহাজডুবির রাত

—স্বপ্ন

শহরের আগে যুগ্ম বিশেষণ 'ধেড়ে ও রোমশ'-এর মত বিরল সাহসী শব্দচয়ন আমাদের চমকে দিয়ে যায়, যেমন মুগ্ধ হই 'গভীর ধাক্কায়', 'ঝলমলে হাততালি' কিংবা 'চুরমার ভিড়'-এর অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে। 'এই দেহ, সম্পূর্ণ সন্দেহ' মধ্য মিলের উজ্জ্বল নজীর ; আর অন্ত্যমিল শ্রেষ্ঠতা পায় 'সময়, সবুজ ডাইনি'-র 'প্রথম ম্যাটিনি শো' কবিতাটির 'শীত' ও 'টিকিট'-এর অপূর্ব সহবাসে। তবু বলতে হয়, রণজিতের যথার্থ স্বস্তি সম্ভবত ছন্দোবদ্ধ কিন্তু অমিল কবিতার গড়নে ; সেখানে তাঁর অমোঘ বিশ্বস্ততা উপমায় আর উপমাহীনতায় যতখানি স্ফূর্তি পায়, অন্যতর নির্মাণে বোধহয় ততখানি নয় ; কৃত্রিম মিলের অস্বাচ্ছন্দ্যে তিনি আহত হতে দেননি তাঁর বিষয় উপস্থাপনাকে, এবং এই নির্বাচিত মাধ্যমেই তাঁর উপহার দেওয়া পঙ্‌ক্তিমালা ও ভাবনাগুচ্ছের কাছে অনেক ঋণ গচ্ছিত হয়ে আছে সত্তর আর আশির দশকের বাংলা কবিতার,

আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাতে শুয়ে থাকো কিছুকাল
তোমার লাজুক পেটে লাথি মেরে হেঁটে যাক বাজারের থলি-হাতে
বিষণ্ণ মানুষ

—আমাদের লাজুক কবিতা

আমি কি জেনেছি সব—কোন্ ফুটপাতে সেই বন্ধুটির রক্তাক্ত রুমাল
সংকেতচিহ্নের মতো পড়েছিল, কেন তার গন্ধ শুঁকে শুঁকে
প্রসূতিসদনে গিয়ে থেমেছিল সরকারী কুকুর ?

—সেই বন্ধুটির গল্প

জুতোর ফিতে বাঁধতে সকালে নীচু হয়েছিল যে লোকটি,
বাকি দিনটা তার ওই নীচুভাবেই কেটে গেল।
সে টের পেল না।

—সান্ধ্য হুইস্কির আগের দৃশ্য

গদ্যের গড়নেই হোক কিংবা ছন্দের বিন্যাসেই হোক, গভীরতাই তাঁর অন্বিষ্ট ; অতর্কিতে সরল কথন পৌঁছে যায় দ্বিতীয় কি তৃতীয় স্তরের ঘনতায়। যখন গদ্যকবিতায় আশ্রয় নেন তখনও তার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ একটা চেহারা অটুট রাখেন তিনি ; অনিবার্যতায় আমাদেরও ভেবে নিতে হয়, এ উপস্থাপন ছন্দে বেমানান ছিল, গদ্যের কাঠামোই এখানে কাঙ্ক্ষিত। আবার ছন্দে যখন নিজেকে সমর্পণ করেন, তখনও তাঁর কোনো বিকল্প সম্ভাবনা রাখতে চান না কোনোভাবেই। দু-ক্ষেত্রেই গভীরতায় পা ফেলেন দু-রকম রীতির নির্বাচনে। 'জিপসীদের তাঁবু'-র শেষ কবিতা অশিথিল ছন্দে শুরু হয় এইভাবে,

> একটু বিমূর্ত হলে ওই রূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য হতো।
> সকালের বাসস্টপে যখনই দেখেছি তাকে, একথা ভেবেছি
>
> —ধর্মযুদ্ধ

এই জাতের আরেকটি ছবি 'সময়, সবুজ ডাইনি'-র 'অশ্রুপারাবার' কবিতায় গদ্যনির্ভরতায় যখন পেশ করেন, শৈথিল্য সেখানেও আসে না, আলগা হয়ে যায় না তাঁর পরিবেশনভঙ্গি, বরং আমার বিবেচনায় তা আরো ঘনবদ্ধ আর সংকেতবাহী হয়ে ওঠে টানটান নিপুণতায়,

> যা ছিল দূরত্ব, আজ তাকে গভীরতা মনে হয়। বাসস্টপে ক্লান্তমুখে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটি, কিংবা রাস্তার ওপাশে ঐ যে ছাতিম গাছ, সবই মনে হয় আমার থেকে একটু গভীরে। টের পাই, ডাকবাক্সে চিঠি ফেলতে যাওয়া কী নিঃঝুম ডুবসাঁতার। যত ভাবি, ততই চারপাশে ঘনিয়ে ওঠে এই আনুভূমিক সমুদ্র, পায়ের তলায় ফুলে ওঠে জল। এই অতলভ্রম কাটানোর জন্যে খুঁজি রুদ্রাক্ষ, খুঁজি ঘুণ-ধরা অট্টহাসি। কিন্তু পেয়ে যাই তার চেয়েও কঠিন সম্বল—মানুষের শুকনো চোখ। রাতের পর রাত আমি সেই নির্জলা দৃষ্টির গায়ে আঙুল বুলিয়ে দেখি—সবই পাথরের ভাষা, পাথরের অহং

বাসস্টপে দাঁড়ানো ক্লান্তমুখ অতলস্পর্শী মেয়ে, নিঃঝুম ডুবসাঁতারের মতো চিঠি ফেলতে যাওয়া, আনুভূমিক সমুদ্র আর পাথরের অহং—এসব বোধহয় গতানুগতিক ছন্দের শৃঙ্খলায় উন্মেষিত হত না ; এর জন্য জরুরি ছিল এই গদ্যই, নিরুচ্চার, নিরুচ্ছ্বাস গদ্য।

অন্তরীপ

সম্পাদক সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৫ খেলাত বাবু লেন টালাপার্ক কলকাতা-৩৭

মুদ্রক সোম প্রিণ্টার্স ৭ কানাইলাল চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭৬

পাঁচ টাকা